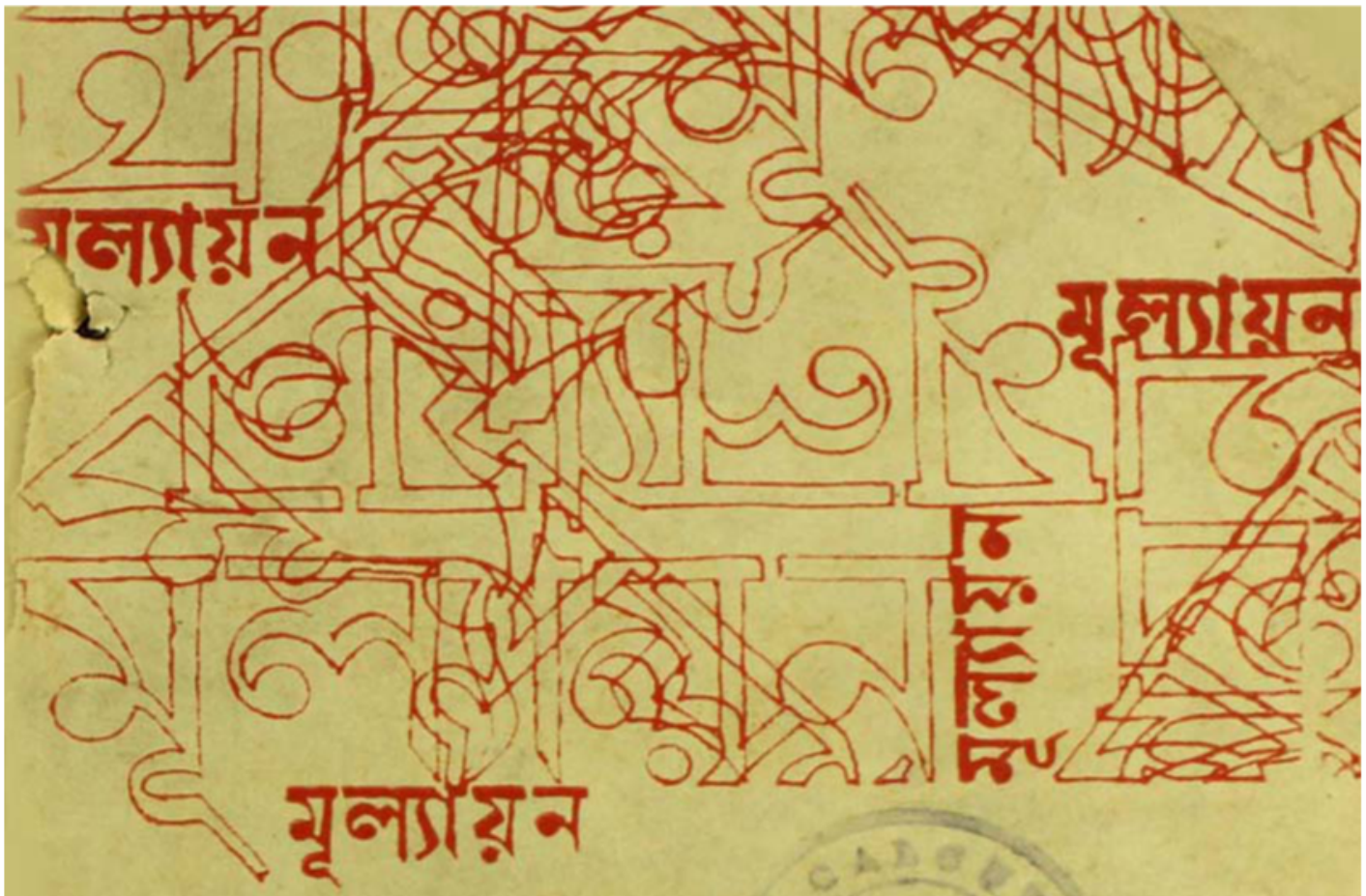

CALCUTTA

• ভারতে বিচ্ছিন্নতাবাদের বিপদ • পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন : তত্ত্ব, তথ্য ও তাৎপর্য • সোভিয়েত পার্টি কংগ্রেস ও মতাদর্শগত সংগ্রাম • সমাজতান্ত্রিক সমাজে দ্বন্দ্ব : উৎস ও স্বরূপ • ভারতে কৃষক আন্দোলনে মধ্য-কৃষকের প্রকল্প • কবি সুকুমার রায় • সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আলোকে মুর্শিদাবাদ • গান্ধীজী প্রসঙ্গে।

নববর্ষ
১৩৯৪

দাম : পাঁচ টাকা

মূল্যায়ন

বর্ষ ২৩

১৩৯৪

সূচী

	পৃষ্ঠা
কবি সুকুমার রায় / ভুজঙ্গ ভূষণ ভট্টাচার্য	১
সমাজতান্ত্রিক সমাজে দ্বন্দ্ব : উৎস ও স্বরূপ / শোভনলাল দত্তগুপ্ত	৮
ভারতের কৃষক আন্দোলন ও মধ্য কৃষকের প্রকল্প / ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৩
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আলোকে মুর্শিদাবাদ / বিষাণ কুমার গুপ্ত	২৮
পারমাণবিক যুগে মতাদর্শগত সংগ্রামের নতুন ধারা / রণধীর দাশগুপ্ত	৪৭
গান্ধীজী প্রসঙ্গে / সুকুমার মিত্র	৬৩
পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন : তত্ত্ব, তথ্য ও তাৎপর্য / সত্যব্রত দত্ত	৭৬
বিচ্ছিন্নতাবাদের সমস্যা / নরহরি কবিরাজ	৯৩

সম্পাদক : নরহরি কবিরাজ

উপদেষ্টামণ্ডলী :

সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার, সুশীল জানা,

নির্মাল্য বাগচী, রণধীর দাশগুপ্ত

প্রচ্ছদ : সুবোধ দাশগুপ্ত

সমীক্ষা প্রকাশনীর পক্ষে রণধীর দাশগুপ্ত কর্তৃক কালান্তর প্রেস, ৩০/৬ কাউলা রোড, কলিকাতা-১৭ হইতে মুদ্রিত ও ১০ বঙেল রোড, কলিকাতা-১৯ থেকে প্রকাশিত।

শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি দায়বদ্ধতার এক দশক

মে দিবসে নতুন করে অঙ্গীকার

১৯৭৭ সালে ক্ষমতাসীন হবার সময় থেকেই বামফ্রন্ট সরকার মেহনতী মানুষের স্বার্থের অতন্দ্র প্রহরী। শ্রমজীবী মানুষ পেলেন এক নতুন আশা ও আত্মবিশ্বাস। যার ফলে শ্রমিকশ্রেণীর সকল স্তরে ঐক্য ও সংহতি সুদৃঢ় হয়েছে। এই ঐক্য ও সংহতি হ'ল ঐতিহাসিক মে দিবসের সংগ্রামী আহ্বান।

বিগত এক দশকে শ্রমক্ষেত্রে বামফ্রন্ট সরকারের উল্লেখযোগ্য সাফল্যের মধ্যে রয়েছে শ্রমজীবী মানুষের ট্রেড ইউনিয়নের অধিকারকে সুরক্ষিত করা ও তাঁদের উপযুক্ত মর্যাদা দান, রাজ্যের প্রধান শিল্পগুলিতে দ্বিপাক্ষিক ও ত্রিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদন, শ্রমিককল্যাণে ন্যূনতম বেতন-আইনের প্রয়োগ, কৃষিমজুরীর বৃদ্ধি এবং আরো অনেক সমাজকল্যাণমূলক প্রকল্পের রূপায়ণ। এক নতুন শিল্প পরিবেশ আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গে উন্নততর অর্থনীতি গড়ে তোলার পথ সুগম করেছে।

শ্রমিকশ্রেণীর এক উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের সূচনা করেছে বামফ্রন্ট সরকারের বিভিন্ন গণমুখী কর্মসূচী।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

Gorky Sadan

House of Soviet Culture

3, Gorky Terrace, Calcutta-17

Phone : 44-2791, 44-5407

- LIBRARY : All kinds of Soviet Books are available in English, Hindi, Bengali, and other Indian languages.
- •• AUDITORIUM : Discussion, Seminars, Lectures on different topics are held. Films are shown. Cultural Functions. Drama Performances.
- ••• FILM LIBRARY : Soviet films on different subjects are given on loan without any charges.
- •••• EXHIBITION HALL : Exhibition of photographs, posters, paintings on various fields of Soviet life are exhibited.
- ••••• RUSSIAN LANGUAGE COURSES :
  1. Ten Months Intensive Course.
  2. Ten Months Diploma (2nd) Course.
  3. Ten Months Post Diploma (3rd Course.

Twice a Week
Mondays & Thursdays or Tuesdays & Fridays (8-30 a.m. to 10-30 a.m. or 6-00 p.m. to 8 p.m.)
Session from January.

জন্ম ও মৃত্যু পঞ্জীকরণ

- সারা দেশে আইন অনুসারে পরিবারের প্রতিটি জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধভুক্ত করা বর্তমানে বাধ্যতামূলক।

- **জন্ম ও মৃত্যুর প্রমাণপত্র কেন প্রয়োজন**

  বিদ্যালয়ে ভর্তি, চাকরি, ভোটাধিকার অর্জন, সামাজিক নিরাপত্তা, পাশপোর্ট সংগ্রহ, বীমা পলিসি পাওয়া, পেনশনের নিষ্পত্তি, সম্পত্তি সংক্রান্ত দাবীর নিরসন ইত্যাদি প্রসঙ্গে।

- **শিশুকল্যাণ ও মাতৃমঙ্গল**

  কল্যাণকামী রাষ্ট্রে শিশুদের যথাযথ বিকাশ ও মাতৃমঙ্গল সংক্রান্ত পরিসেবার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। এই উদ্দেশ্যে নির্ভুল জনসংখ্যা, তার গতিপ্রকৃতি ও বিভিন্ন নীতির যথাযথ মূল্যায়নের জন্য জন্ম-মৃত্যুর পঞ্জীকরণ একান্ত আবশ্যক।

- **কাকে সংবাদ পৌঁছে দেবেন।**

  শহরাঞ্চলে কর্পোরেশন বা মিউনিসিপ্যালিটি, নোটিফায়েড এরিয়া বা ক্যান্টনমেন্টে ভারপ্রাপ্ত অফিসার এবং গ্রামাঞ্চলে ব্লক স্যানিটারী ইন্সপেক্টর-এর কাছে জন্ম বা মৃত্যুর সংবাদ দিতে হবে।

- **কতদিনের মধ্যে**

  শহরাঞ্চলে জন্মের সাতদিন ও মৃত্যুর তিনদিন এবং গ্রামাঞ্চলে জন্মের চৌদ্দদিন এবং মৃত্যুর সাতদিনের মধ্যে সংবাদ পৌঁছানো আবশ্যক। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্যাদি পেশ করলে পঞ্জীকরণের প্রমাণপত্র বিনামূল্যে দেওয়া হয়।

—পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই সি এ ১৭৭৮/৮৭

কবি সুকুমার রায়

ভুজঙ্গ ভূষণ ভট্টাচার্য

ভাষার মাধ্যমে মানুষ যেদিন থেকে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করতে শিখেছে—সেদিন থেকেই সে তার কল্পনা ও ধ্যানলব্ধ সত্যকে ছন্দের মাধ্যমে অন্যের নিকট উপস্থাপিত করবার চেষ্টা করেছে। এই যে ধ্যানলব্ধ আনন্দকে সে নিজের মনন শক্তির মাধ্যমে উপলব্ধি করেছে তাকে উপযুক্ত বাক্য ও শব্দের বন্ধনে সুকৌশলে ছন্দোবদ্ধ উপস্থাপনই হল কবিতা। রাজশেখর বসু মহাশয় তাঁর 'সাহিত্যের পরিধি' নামক প্রবন্ধে কবিতার form সম্পর্কে কবি নীলকণ্ঠ দীক্ষিতের নিম্নলিখিত শ্লোকটি উল্লেখ করেছেন—

যানেব শব্দান বয়মালপাম:
যানেব চার্থান্ বয়মুল্লিখাম:।
তৈরেব বিন্যাস বিশেষ ভব্যৈ:
সম্মোহয়ন্তীহ কবয়ো জগন্তি ।।

অর্থাৎ আমরা যেসব শব্দ বলি, যেসব অর্থ প্রয়োগ করি, তাদেরই বিশেষ প্রকার ভব্য বিন্যাস দ্বারা কবিগণ জগৎকে সম্মোহিত করেন।

কবিতা হল অন্তরের উপলব্ধিজাত। কবিতার সৃষ্টি হয় অন্তরের চাহিদা থেকে। আত্মপ্রকাশের তীব্র ইচ্ছা থেকেই এই চাহিদার সৃষ্টি। রৌদ্র, হাওয়া ও বৃষ্টির সংস্পর্শে এসে মাটীর নিচের সুপ্তবীজ অঙ্কুরিত হয়। কবিতাও তেমনি কবির মানস অন্তঃপুরের সযত্নে লালিত সৌন্দর্য বোধের প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথ কবিতার তিনটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। এ গুলি হল—(১) সৌন্দর্য, (২) সত্য ও (৩) শিল্পকলা। সৌন্দর্যকে কবি প্রকাশ করেন উপযুক্ত শব্দায়নে। ভাষাশৈলী ও সঠিক উপলব্ধি জাত বর্ণনার মাধ্যমে। কিন্তু সৌন্দর্যই একমাত্র শেষ কথা নয়। সৌন্দর্য তখনই সম্পূর্ণ হয় যখন সৌন্দর্য সত্যকে প্রকাশ করে। কবির মতে 'সত্যই হল সৌন্দর্য' অর্থাৎ Truth is beauty. কিন্তু কাব্যে এই সত্যের তাৎপর্য কি? রবীন্দ্রনাথ বলেছেন প্রকৃত সত্যের বোধ থেকেই আনন্দের সৃষ্টি। অনেক সমালোচক কবিতার বিষয় বর্ণনাকে অবাস্তব বলতে পারেন; কিন্তু কবিতাকে তখনই [illegible] যখন কবিতার বর্ণিত বিষয়বস্তু আমাদের

আনন্দ দেয়। সমস্ত কিছু সৃষ্টির মধ্যেই রয়েছে আনন্দ এবং কাব্যের উপলব্ধিতে আনন্দ পাওয়াই হল—কবিতা পাঠের শেষ কথা।

কিন্তু কাব্যের শিল্পকলাকে বাদ দিয়ে কবিতাকে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। কেননা শিল্পের মধ্যে রয়েছে সৃষ্টির প্রেরণা।

"লীলায়িত অলংকৃত ভাষার মধ্যে অর্থকে ছাড়িয়েও একটি বিশিষ্ট রূপ প্রকাশ পায়—সে তার ধ্বনি প্রধান গীতধর্মে।" (রবীন্দ্রনাথ)। কাব্য পাঠের মাধ্যমে যদি হৃদয়ের সাড়া পাওয়া যায় তবে তাতে কারও নালিশ থাকে না।

কবি সুকুমার রায়কে নিয়ে যদি আমরা আলোচনা করতে চাই—তখন এই পথ দিয়েই আমাদের অগ্রসর হতে হবে। যে কোন কারণেই হোক অনেক পাঠক ও সমালোচক সুকুমার রায়কে ফ্যানটাসী ও ননসেন্সধর্মী ছড়ার লেখক হিসাবে গণ্য করতে চান। তার কারণ এই যে সুকুমার প্রতিভার অন্য বৈশিষ্ট্য-গুলি তাদের নিকট তেমনি স্পষ্ট নয়। সুকুমার রায়ের কৌতুকধর্মী মনের পটে আরও নানারূপের যে কাব্যধর্মী উচ্চমানের সৌন্দর্যের খেলা চলছে—তার দিকে অনেকেরই দৃষ্টি পড়ে নি। এই প্রসঙ্গে রাজশেখর বসুর মন্তব্যটি উল্লেখ-যোগ্য। তিনি লিখেছেন—

"লুইস ক্যারোলের অ্যালিস ইন ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য লিখিত হলেও সকল পাঠকের সমাদর পেয়ে চিরায়িত হয়েছে। সুকুমার রায়ের 'আবোল তাবোল' আরও উচ্চশ্রেণীর রচনা মনে করি। চিত্র আর তক্ষণ কলার যেমন impressionable style এবং অবাস্তব সংস্থান দ্বারা রসসৃষ্টি করা হয়, সুকুমার রায় তার ছড়া রচনায় সেইরূপ পদ্ধতির সার্থক প্রয়োগ করেছেন। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের পাঠক ও সমালোচকদের মধ্যে রামগরুড়ের ছানার বাহুল্য আছে, তাই সুকুমার রায়ের প্রতিভা যথোচিত মর্যাদা পায় নি।"

প্রথমেই 'আবোল তাবোলের' কবিতাগুলি নিয়ে পরীক্ষা করা যাক। আবোল তাবোলের কবিতাগুলি মূলত: ননসেন্সধর্মী হলেও এই কবিতাগুলির মধ্যে কোথায়ও কোথায়ও সুকুমার রায়ের কাব্যধর্মী মনের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। কয়েকটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

যেমন— যায়না বনের কাছে, কিম্বা গাছে গাছে
দখিন হাওয়ার সুড়সুড়িতে
হাসিয়ে ফেলে পাছে।

অথবা, ঝোপের ধারে ধারে রাতের অন্ধকারে
জোনাক জ্বলে আলোর তালে
হাসির ঠারে ঠারে। (রামগরুড়ের ছানা)

অথবা, পুবদিকে মাঝরাতে ছোপ দিয়ে রাঙা
রাতকানা চাঁদ ওঠে আধখানা ভাঙা। (হুলোর গান)

উপরের তিনটি কবিতাংশের মাধ্যমে সুকুমার রায়ের কাব্যমাধুর্যের একটি আভাস পাওয়া যায়।

প্রাকৃতিক বর্ণনামূলক কবিতার মাধ্যমেও সুকুমার রায় তার কাব্যিক বোধকে আশ্চার্যরূপে বর্ণনা করেছেন। যেমন—

"হেথায় রঙিন আকাশ তলে
স্বপন দোলা হাওয়ায় দোলে,
সুরের নেশায় ঝরণা ছোটে
আকাশ কুসুম আপনি ফোটে
রঙিয়ে আকাশ, রঙিয়ে মন
চমক জাগে ক্ষণে ক্ষণ।" (আবোল তাবোল।)

কবি তাঁর বর্ষশেষ কবিতায় তাঁর বিজ্ঞান চেতনাকে ও বৎসরের বর্ণনাকে একসঙ্গে মিশিয়েছেন। যেমন—

ফেলে দিয়ে পুরাতন জীর্ণ এ খোলসে
নূতন বরষ আসে, কোথা হতে বলসে!
কবে যে দিয়েছি চাবি জগতের যন্ত্রে,
সেই দমে আজও চলে না জানি কি মন্ত্রে!
পাকে পাকে দিনরাত ফিরে আসে বারবার—
ফিরে আসে মাস ঋতু—এ কেমন কারবার।
* * *
রবি যায়, শশী যায় গ্রহতারা সব যায়—
বিনা কাঁটাকম্পাসে বিনা কলকব্জায়। ইত্যাদি।

কবিতাটির মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে কবির বিজ্ঞানধর্মী চেতনা। তার সঙ্গে কাব্যিক চিন্তাধারা মিশিয়ে কবি কাল-আবর্তনের ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। কবিতাটিতে কবি উল্লেখ করেছেন—'বিনা কলকব্জায়'। আসলে [illegible]

সৃষ্টির, আদি শক্তির জোর যাকে বৈজ্ঞানিকেরা বলেছেন—'Original Momentum'।

শ্রাবণে কবিতাটিতে কবি শ্রাবণের বৃষ্টিধারাকে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বর্ণনা করেছেন। যেমন—

জল ঝরে, জল ঝরে সারাদিন সারারাত
অফুরান নামতায় বাদলের ধারাপাত

অথবা, উৎসব ঘনঘোর উন্মাদ শ্রাবণের
শেষ নাই শেষ নাই বরষার প্লাবনের।

শেষ দুটি লাইনে কবি বলেছেন—

শুধু যেন বাজে কোথা নিঃঝুম ধুকধুক,
ধরণীর আশা ভয় ধরণীর সুখ দুখ।

শ্রাবণের ঝমঝম বৃষ্টি ধারার বর্ণনাটি শিশু পাঠকদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত করে এই কবিতায় উপস্থাপিত করেছেন অর্থাৎ—তিনি বলেছেন 'অফুরান নামতায় বাদলের ধারাপাত।' পূর্বে গুরুমশায়ের পাঠশালায় 'নামতা পাঠ' একটি অবশ্য করণীয় বিষয় ছিল। বিদ্যালয়ে নিয়মিত পঠনপাঠনের পরে পড়ুয়ারা সার বেঁধে দাঁড়িয়ে সর্দার পড়োর সঙ্গে সুরু করে ধারাপাতের নামতা আবৃত্তি করতো। কবি সেই নামতার ধারাপাতের সঙ্গে বাদলের ধারাপাতের তুলনা করেছেন। কবিতার শেষ দুটি লাইনে তিনি চমৎকারভাবে কবিতাটির উপসংহার টেনেছেন। তিনি বলেছেন:—"এই নিরবচ্ছিন্ন বৃষ্টিধারার মধ্যে ধরণীর সুখদুঃখের স্পন্দন শোনা যাচ্ছে।

হাস্যকৌতুকের মধ্যেও যে বিষয়টি সুকুমার রায়কে বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছে সেটি হল বিশ্ব প্রকৃতির নানা রঙ, রূপ ও শব্দ। সুকুমার রায় 'মেঘ'কে নিয়ে যে কবিতা লিখেছেন তাতে তাঁর কবিত্ব শক্তি যে ভাবে প্রকাশ পেয়েছে—তেমনি উহা প্রকাশপেয়েছে তাঁর 'আজব খেলা' নামক কবিতায়। যেমন—

সাগর মেলায় লুটিয়ে পড়ে নতুন মেঘের দেশে
আকাশ ধোয়া নীল যেখানে সাগর জলে মেশে,
মেঘের শিশু ঘুমায় যেথা আকাশ দোলায় শুয়ে
ভোরের রবি জাগায় তারে সোনার কাঠি ছুঁয়ে।

এই কবিতার অন্যত্র তিনি আরও লিখেছেন—

সোনার মেঘে আলতা ঢেলে সিঁদুর মেখে গায়
সকাল সাঁজে সূর্যি মামা নিত্যি আসে যায়
নিত্যি খেলে রক্তের খেলা আকাশ ভরে ভরে,
আপন ছবি আপনি মুছে আঁকে নূতন করে।

কিন্তু কবি অনুভব করেছেন যে প্রকৃতির এই রঙের খেলার শেষ নেই।

ফুরোয় নাকি সোনার খেলা? রঙের নাহি পার,
কেউ কি জানে কাহার সাথে এমন খেলা তার।

অনুরূপ আর একটি কবিতা হল—'আয়রে আলো আয়'। এই কবিতায় কবি লিখেছেন—

পুবগগনে রাত পোহাল,
ভোরের কোলে লাজুক আলো নয়ন মেলে চায়।
আকাশ তলে ঝলক জ্বলে,
মেঘের শিশু খেলার ছলে আলোক মাখে গায়।

'এই কবিতাটিকে কবি' ভোরের লাজুক আলোকে ছোট শিশুর সঙ্গে তুলনা করেছেন। ছোট শিশুরা মায়ের কোলে ঘুম ভেঙে যেমন লাজুক চোখে তাকায় তেমনি ভোরে লাজুক আলো ভোর বেলায় নয়ন মেলে তাকাচ্ছে। আবার খেলার সময়ে যেমন ছোট শিশুরা ধুলি বালি মাখে, তেমনি মেঘের শিশু খেলার ছলে আলোক গায়ে মাখছে।

কবি প্রকৃতির সমস্ত দৃশ্যের মধ্যেই আনন্দকে উপলব্ধি করেছেন। তাই তিনি লিখেছেন—

"যে আনন্দ ফুলের বাসে, যে আনন্দ পাখির গানে
যে আনন্দ অরুণ আলোয়, যে আনন্দ শিশুর প্রাণে,
সে আনন্দ আলোর মত থাকুক তব জীবন ভরি।"

সুকুমার রায়ের কাব্যমাধুর্য প্রকাশ পেয়েছে বিচিত্র ভঙ্গিতে তার—'খাই খাই' নামক কবিতা পুস্তকে। শব্দকে নানাভাবে নানা আঙ্গিকে ব্যবহার করবার যে স্টাইল তিনি তাঁর ঐ পুস্তকের বিভিন্ন কবিতায় প্রকাশ করেছেন তা বিশেষভাবে আলোচনার অবকাশ রাখে। বাংলা ভাষার শব্দ ঐশ্বর্যের ভাণ্ডারে যে কত মণি-মাণিক্য সঞ্চিত আছে এবং বিভিন্ন উদ্দেশ্যে কিভাবে ঐগুলি ব্যবহার করা যায় তা সুকুমার রায়ের পূর্বে কেউ দেখিয়েছেন বলে মনে হয় না। তাই কবি বলেছেন—

'এ সব কথা শুনলে তোদের লাগবে মনে ধাঁধা,
কেউ বা বুঝে পুরোপুরি কেউ বা বুঝে আধা।"

একই শব্দের বিভিন্ন ব্যবহারে পাঠকদের মনে চমক লাগতে পারে। তাই কবির ভাষায় 'কারে বা কই কিসের কথা কই যে পক্ষে পক্ষে। কথাগুলি একবার শুনলে পাঠকদের মনের সন্দেহ দূর হতে পারে। কারণ—

'এক একটি কথায় যেন সদ্য জাগে কামান,
মন বসনের ময়লা ধুতে তত্ত্ব কথাই সাবান।'

যেহেতু পুস্তক খানির নাম 'খাই খাই', তাই খাই শব্দটির বিচিত্র ব্যবহার কবি প্রথম কবিতাটিকে উল্লেখ করেছেন। যেমন—

'খাই, খাই কর কেন, এস বস আহারে
খাওয়াব আজব খাওয়া, ভোজ কব যাহারে।

অন্যত্র— জল খায়, দুধ খায়, খায় যত পানীয়
জ্যাঠা ছেলে বিড়ি খায়, কান ধরে টানিও।

আবার— তেলে জলে 'মিশ খায়', শুনেছ তা কেউ কি ?
যুদ্ধে যে গুলি খায় গুলিখোর সেও কি ?

অনুরূপভাবে সুকুমার রায় 'পাকাপাকি শব্দটির নানা ব্যবহার দেখিয়েছেন। যেমন—

"আমপাকে বৈশাখে কুল পাকে ফাগুনে,
কাঁচা ই'ট পাকা হয় পোড়ালে তা আগুনে।
জোড়ে জলে টিকে রঙ, পাকা কই তাহারে ;
ফলারটি পাকা হয় লুচি দই আহারে।

আবার লিখেছেন—

পাকায়ে পাকায়ে দড়ি টান হয়ে থাকে যে।
দুহাতে পাকালে গোঁফ তবু নাহি পাকে সে।"

সুকুমার রায় রচিত কবিতাগুলি যখন পড়ি তখন অবাক হয়ে যাই—তাঁর শব্দচয়ন, প্রকাশভঙ্গি ও ভাষার মুন্সিয়ানাতে। বাংলা ভাষার শব্দ-সম্ভারকে তিনি তাঁর খেয়ালখুসি মতো তাঁর মনের ভাব প্রকাশের বাহন হিসাবে ব্যবহার করেছেন। ভাষার উপর কি ধরনের অধিকার থাকলে এরূপ-ভাবে শব্দের ব্যবহার সম্ভব তা একমাত্র সুকুমার রায়ের মধ্যেই আমরা দেখতে

পাই। এই সম্পর্কে কয়েকটি কবিতাংশের উল্লেখ করলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে। যেমন, দাঁড়ের কবিতায় আমরা পাই—

চুপ কর্, শোন, শোন্ বেয়াকুল হোসনে
ঠকে গেছি বাপরে কি ভয়ানক প্রশ্নে।
একদিন দাঁড়ি মাঝি-দাড়ি তার মস্ত
দাড়ি দিয়ে দাঁড়ি তার দাঁড়ে খালি ঘসত।
পাখা হলে 'পাখি' হয়, ব্যাকরণ বিশেষে
কাঁকড়ার 'দাঁড়া আছে, দাঁড়ি নয় কি সে যে?

ইত্যাদি

'হিংসুটিদের গান' থেকেও কয়েকটি লাইন উল্লেখ করা যেতে পারে।

যেমন, "আমরা ভালো লক্ষী সবাই তোমরা ভারি বিশ্রী,
তোমরা খাবে নিমের পাঁচন, আমরা খাব মিশ্রী।
আমরা পাব খেলনা পুতুল, আমরা পাব চম্ চম্,
তোমরা ত তা পাচ্ছ না কেউ, পেলেও পাবে কম্ কম্।"

ইত্যাদি।

সুকুমার রায়ের কবিতাগুলিকে মোটামুটিভাবে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, যেমন—

(১) লিমেরিক বা ননসেন্স জাতীয় কবিতা
(২) প্রাকৃতিক বর্ণনামূলক কবিতা
(৩) শৈশব কালের নানা সমস্যা মূলক কবিতা
(৪) চিত্রাঙ্কিত কবিতা

এবং (৬) বিশেষ ধরনের কৌতুক আশ্রিত কবিতা।

তবে সুকুমার রায়ের রচিত কবিতার মধ্যে ননসেন্স ও ফ্যানটাসী জাতীয় কবিতার সংখ্যাই বেশি। তার কারণ বোধহয় মোটামুটিভাবে কৌতুককেই তিনি তাঁর জীবনদর্শন হিসাবে গ্রহণ করেছেন। সাধারণ পাঠকেরাও তাঁকে ননসেন্স ধর্মী কবিতার রচয়িতা হিসাবে দেখেন। কিন্তু সুকুমার রায়ের কৌতুকের পিছনে রয়েছে একটি বাস্তবাশ্রিতভঙ্গি, শুধুমাত্র কৌতুকের জন্যই তিনি কৌতুক সৃষ্টি করেন নি।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে দ্বন্দ্ব ঃ উৎস ও স্বরূপ

শোভনলাল দত্তগুপ্ত

সমাজতান্ত্রিক সমাজ সম্পর্কে সাধারণভাবে একটি ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত আছে যে যেহেতু এটি একটি শোষণমুক্ত ব্যবস্থা, সেই কারণে এখানে ধনতান্ত্রিক সমাজের মতো কোন দ্বন্দ্বের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয় না। এই ধরনের ভাবনার মূলে রয়েছে, লেনিনের কথায়, সংঘাতের সঙ্গে দ্বন্দ্বকে এক করে দেখার চেষ্টা। ঐতিহাসিক কারণেই ধনতান্ত্রিক সমাজে দ্বন্দ্বের চরিত্র সংঘাতধর্মী হতে বাধ্য। সমাজতান্ত্রিক সমাজে এই ধরনের দ্বন্দ্বের অনুপস্থিতির ফলে আমরা অনেক সময়ে অতি সরলীকৃত এক সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে সমাজতান্ত্রিক সমাজে শোষণব্যবস্থার উপশমের সঙ্গে সঙ্গে দ্বন্দ্বেরও অবসান ঘটে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যা ঘটে সেটি হল এই যে, সমাজতন্ত্রে দ্বন্দ্বের চরিত্রটি হয় অবৈর বা সংঘাতমুক্ত, কিন্তু দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে না। বরং সমাজতান্ত্রিক সমাজে দ্বন্দ্বের গতি প্রগতির পথকে সুনিশ্চিত করে, আর ধনতান্ত্রিক সমাজে এই দ্বন্দ্বই সৃষ্টি করে পুঁজিবাদের সংকট। বলা বাহুল্য, পুঁজিবাদী সমাজে শ্রম ও পুঁজির বৈর সম্পর্ক দ্বন্দ্বকে একটি সংঘাতমূলক চরিত্র প্রদান করে, সেটি সমাজতান্ত্রিক সমাজে থাকে অনুপস্থিত। স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দ্বন্দ্বের অবস্থান কি গুণগতভাবে এতটাই ভিন্ন যে তার ফলে সৃষ্টি হয় সংকট নয়, প্রগতি ?

সাধারণভাবে বলা যেতে পারে যে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় আমরা মূলতঃ তিনটি স্তরে দ্বন্দ্বের উপস্থিতি লক্ষ্য করি। প্রথমতঃ, অতীতের বিভিন্ন ধ্যান-ধারণা, পুরনো ভাবনাচিন্তা ও মানসিকতার সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক মানসিকতা ও মূল্যবোধের দ্বন্দ্ব। এই ধরণের দ্বন্দ্বের উৎসগুলি প্রধানতঃ নিহিত থাকে ইতি-হাসগত কারণেই আর্থ-সামাজিক কাঠামোর মধ্যে। দ্বিতীয়তঃ, সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কের সঙ্গে অগ্রসরমান উৎপাদিকা শক্তির দ্বন্দ্ব সমাজতন্ত্রের প্রগতিকে ত্বরান্বিত করার শক্তি যোগায়। যেহেতু পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় এই

সমাজতন্ত্রে এর ফল হয় সম্পূর্ণ বিপরীত। তৃতীয়তঃ, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সামাজিক প্রগতির মূল গতির সঙ্গে জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, চাহিদা প্রভৃতির দ্বন্দ্ব সৃষ্ট হতে পারে এবং উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব সমাজতন্ত্রের প্রগতির পথে ভবিষ্যতে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করতে পারে।

এ কথা অবশ্যই ঠিক যে উল্লেখিত দ্বন্দ্বগুলির কোনটিই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মতো সংঘাতধর্মী নয় এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বৈর দ্বন্দ্ব উৎসারিত হবার মতো কোন সামাজিক-অর্থনৈতিক ভিত্তি না থাকার ফলে অনেকেই মনে করেন যে প্রতিষ্ঠিত একটি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংঘাতধর্মী দ্বন্দ্ব কোন সময়েই প্রকাশ পাবে না। এই প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করে গত এক দশকেরও বেশি সময়ে সমাজতান্ত্রিক দেশের গবেষকদের মধ্যে যে বিতর্ক গড়ে উঠেছে, এক নজরে তার পর্যালোচনা এই প্রশ্নটিকে বোঝার পক্ষে বিশেষ সহায়ক হবে। ১৯৭২ সালে World Marxist Review পত্রিকায় প্রয়াত সোভিয়েত গবেষক য়েজারমান তাঁর রচিত একটি প্রবন্ধে সমাজতন্ত্রে দ্বন্দ্বের উপস্থিতির প্রশ্নটিকে বিশ্লেষণ করেন (Contradictions Under Socialism March 1972)। এই বিষয়টিকে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি একটি মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপন করেন, যার সারবস্তুটি হল এইরকম: সমাজতন্ত্রের বাস্তব পরিস্থিতি বিশেষ অনুকূল হবার ফলে এ কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সমাজব্যবস্থার সেই চাহিদা পূরণের অসাফল্যের যে দ্বন্দ্ব অনেক ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়, তা নিরসন করার সম্ভাবনা যথেষ্টই উজ্জ্বল। কিন্তু এই দ্বন্দ্ব নিরসনের সম্ভাবনাকে স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে ধরে নিলে গুরুতর বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। এই প্রসঙ্গে য়েজারমান বলেন, দ্বন্দ্বের নিরসন সঠিক পথে হবে কিনা, সেটি প্রধানতঃ পার্টি নেতৃত্বের বিচক্ষণতা, জনগণের সঙ্গে পার্টি নেতৃত্বের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ, সর্বোপরি জনসাধারণের সমস্যাগুলিকে উপলব্ধি করার মতো পার্টি নেতৃত্বের মানসিকতার ওপরে নির্ভরশীল। তাই দ্বন্দ্ব নিরসনের সম্ভাবনাকে নিরসনপদ্ধতির সঠিকতার সঙ্গে এক করে দেখাটা হবে সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক। বরং অনেক ক্ষেত্রে এমনও হতে পারে যে জনসাধারণের সঙ্গে সমাজব্যবস্থার সামঞ্জস্য সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠা করতে পার্টি নেতৃত্ব যদি অপারগ ও ব্যর্থ হয়, তবে এই আপাত অবৈর দ্বন্দ্ব শেষ পর্যন্ত সমাজতন্ত্রেও সামাজিক সংঘাতের সৃষ্টি করতে পারে। য়েজারমানের এই বক্তব্যকে কেন্দ্র করে যে বিতর্কের সৃষ্টি

আহারেসকু (রুমানিয়া) এবং নাগি (হাঙ্গেরী)। অপরদিকে ভিন্নমত পোষণ করেন নামাপারি (মঙ্গোলিয়া), আইযহরণ ও ষ্টীলার (জি ডি আর) এবং তাঁদের মতে, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এই ধরনের দ্বন্দ্ব পার্টি নেতৃত্বের ভুলভ্রান্তি থেকে উৎসারিত হলেও তার মূলগুলি নিহিত থাকে সেই সমাজের ইতিহাসের মধ্যে (বিশদ আলোচনার জন্য World Marxist Review, April, 1973 দ্রষ্টব্য)। মতপার্থক্য সত্ত্বেও আলোচনায় অংশগ্রহণ গবেষকরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে প্রথমাবস্থায় দ্বন্দ্বের প্রকৃতি অবৈর হলেও এই দ্বন্দ্বের উৎস ও স্বরূপকে পার্টি নেতৃত্ব সঠিকভাবে অনুধাবন করতে ব্যর্থ হলে শেষ পর্যন্ত তা সমাজতন্ত্রেও বিস্ফোরক পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে ; এক কথায়, দ্বন্দ্বের প্রকৃতি অবৈর হলেও বিশেষ পরিস্থিতিতে তার নিরসন সংঘাতের মাধ্যমেও হবার সম্ভাবনা থাকে। সেই সঙ্গে একথাও বলা হয় যে দ্বন্দ্বের নেপথ্যে ইতিহাসগত কারণ থাকলেও পার্টি নেতৃত্বের বিষয়ীগত ত্রুটিবিচ্যুতি দ্বন্দ্ব নিরসনের পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

সত্তরের দশকে যে বিতর্ক শুরু হয়েছিল, ১৯৬৮ সালে চেকোশ্লোভাকিয়া এবং আশির দশকে পোল্যাণ্ডকে কেন্দ্র করে তার পরিমণ্ডল বর্তমানে আরও ব্যাপকতা লাভ করেছে। সাম্প্রতিককালের আলোচনাকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে সোভিয়েত গবেষকদের মধ্যে এই প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করে দু'টি ভিন্ন মত আছে। কোসলাপভ মনে করেন, সমাজতন্ত্রে সংঘাতমূলক পরিস্থিতি সৃষ্টি হবার পিছনে রয়েছে জনসাধারণের মধ্যেই কিছু লোভী ও স্বার্থান্বেষী ব্যক্তির উপস্থিতি, যাঁরা সামাজিক স্বার্থের বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থকে দাঁড় করিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করে কৃত্রিম উপায়ে সংকটের সৃষ্টি করেন (R. Kosolapov, 'Antagonism or Contradiction, STP, October 1983). এই বক্তব্যের মূল কথাটি হল এই যে সমাজতন্ত্রে সংঘাতময় পরিস্থিতি সৃষ্টির পিছনে কোন সংগঠিত শ্রেণীভিত্তি ইতিহাসগত কারণেই সম্ভব নয়। এই প্রসঙ্গেই ভিন্ন মত পোষণ করেন অপর এক সোভিয়েত গবেষক আনাতোলি বুতেনকো। সমাজতন্ত্রে বৈর দ্বন্দ্ব উৎসারিত হবার নেপথ্যে কোন সংগঠিত শ্রেণীভিত্তি কাজ করে না, এই বক্তব্যকে তিনিও স্বীকার করেন। কিন্তু বুতেনকোর মতে, জনসাধারণ থেকে পার্টি নেতৃত্বের বিচ্ছিন্নতা, তাঁদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, চিন্তাভাবনার শরিক হওয়ার ক্ষেত্রে পার্টির ব্যর্থতা সমাজকে ভুল পথে চালনা করে ও তার পরিণতিতে জনগণের সঙ্গে পার্টিনীতির আপাত

অবৈর দ্বন্দ্ব কালক্রমে বিস্ফোরক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। হাঙ্গেরী (১৯৫৬), চেকোস্লোভাকিয়া (১৯৬৮) এবং সাম্প্রতিককালে পোল্যাণ্ডের ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করে বুতেনকো এই সিদ্ধান্তে আসেন যে প্রতিটি ক্ষেত্রে পার্টিনেতৃত্বের ভ্রান্ত নীতি, সমাজতন্ত্রকে পরিচালনা ও প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের বিচ্যুতি জনসাধারণের মনে যে অসন্তোষ ও ক্ষোভের সঞ্চার করে, তারই পরিণতিতে এই দেশগুলিতে রাজনৈতিক সংকট দেখা দেয়, এবং যা শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক সংঘর্ষের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে। সমাজতন্ত্রবিরোধী শক্তিগুলিও স্বাভাবিক কারণেই এই ধরনের পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে প্রতি-বিপ্লবী চক্রান্ত বাধাবার চেষ্টা করে (A. Butenko, Theory and Practice of Socialism, মস্কো, ১৯৮০)। বুতেনকো খুব স্পষ্ট করেই এ কথা বলেন যে সমাজতন্ত্রে সংঘাতময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে তার জন্য জনসাধারণকে বা অতীতের ঘটনাবলীর জের টেনে ইতিহাসকে দোষী করে কোন লাভ নেই ; যেটি প্রয়োজন সেটি হল আত্মসমালোচনার মাধ্যমে পার্টিনেতৃত্বের ভুলগুলিকে চিহ্নিত করে জনসাধারণের সঙ্গে পার্টির সংযোগকে ত্বরান্বিত করা।

এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে দুটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। প্রথমতঃ, সমাজতন্ত্রে সংঘাতময় দ্বন্দ্ব কোন সময়েই অনিবার্য নয়, যেমনটি ঘটে থাকে ধনতন্ত্রের ক্ষেত্রে। সমাজতন্ত্রে সংঘাতের উপস্থিতি এটা প্রমাণ করে না যে জনসাধারণ সমাজতন্ত্রের বিরোধী, যদিও পশ্চিমী তাত্ত্বিকরা চেকোস্লোভাকিয়া ও পোল্যাণ্ডের ঘটনাবলীর দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে ঠিক এ কথাটাই প্রতিষ্ঠিত করতে চান। প্রকৃতপক্ষে এই ঘটনাগুলি অন্য কথাই প্রমাণ করে। যে অসন্তোষ ও বিক্ষোভ সাম্প্রতিককালে এইসব দেশে পরিলক্ষিত হয়েছে, সেগুলির কোনটিই সমাজতন্ত্রের আদর্শের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয় নি ; সেগুলি পরিচালিত হয়েছে সমাজতন্ত্র পরিচালনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন আমলাতান্ত্রিক, অনেক ক্ষেত্রে গণবিরোধী নীতি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে নয়, বরং সমাজতন্ত্র থেকে বিচ্যুতির বিরুদ্ধেই পরিচালিত হয়েছিল এই প্রতিবাদ এবং পোল্যাণ্ডের ঘটনাবলী সেই শিক্ষাই দেয় (M. Yasakova, 'Contradictions under Socialism: Character, Source and ways of Solving them,' STP, May, 1981)।

দ্বিতীয়তঃ, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় যেমন সংঘাতময় পরিস্থিতি ঐতিহাসিক

কারণেই অনিবার্য এবং কোন অবস্থাতেই তাকে প্রশমিত করা সম্ভবপর নয়, সমাজতন্ত্রের ক্ষেত্রে এই ধরণের বৈরচরিত্রধর্মী সংঘাতের উপস্থিতি ঘটলেও সঠিক পথে অগ্রসর হলে পার্টিনেতৃত্বের পক্ষে জনসাধারণের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার মাধ্যমে সেই দ্বন্দ্বের নিরসন সংঘাতকে ঘনীভূত না করে শান্তিপূর্ণ পথে করা সম্ভব। সমাজতন্ত্রের মূল শক্তি জনসাধারণ। তাই সর্বতোভাবে প্রয়োজন পার্টি ও জনগণের পারস্পরিক সম্পর্ক শক্তিশালী ও ঘনিষ্ঠ করে তোলা। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ২৭তম কংগ্রেসে এই প্রশ্নটিকেই সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের অগ্রগতির থেকে যেসব গুরুতর সমস্যা দেখা দিয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করা হয়েছে। একথা অকপটে স্বীকার করা হয়েছে যে অনেক ক্ষেত্রে পার্টিনেতৃত্ব জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার যথার্থ পরিক হতে ব্যর্থ হয়েছে ও তার পরিণতিতে সোভিয়েত সমাজব্যবস্থার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংকট দেখা দিয়েছে। তাই প্রয়োজন দেখা দিয়েছে শ্রমজীবী মানুষকে সোভিয়েত সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতিটি ক্ষেত্রে অংশীদার করার জন্য ব্যাপকতম অর্থে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার। সেই সঙ্গে যে প্রশ্নটি বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হয়েছে, সেটি হলো পার্টির সাংগঠনিক মানকে গুণগতভাবে বৃদ্ধি করা ও মেহনতি মানুষ এবং পার্টির মধ্যে ঘনিষ্ঠতম সম্পর্ক গড়ে তোলা। তত্ত্বগতভাবে বিচার করলে দেখা যাবে যে প্রতিটি সমস্যাই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দ্বন্দ্বের প্রশ্নের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সি পি এস ইউ-এর ২৭তম কংগ্রেসের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি ভবিষ্যতে আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে উঠবে বলে আশা করা যায়।

ভারতের কৃষক আন্দোলন (১৯২০-১৯৫০)
ও
'মধ্য ও কৃষকের প্রকল্প'

ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিপ্লবের স্তর সমাজতান্ত্রিক বা জনগণতান্ত্রিক যাই হোক না কেন, বিপ্লবের নেতা শ্রমিকশ্রেণী যে ঘনিষ্ঠ সহযোগী মিত্র কৃষকের সমর্থন ছাড়া বিপ্লব সম্পন্ন করতে পারে না, এ বিষয়ে মার্কসবাদী ও অমার্কসবাদী সকলেই একমত ! বিশেষ করে চীনের নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্যের পর ঔপনিবেশিক, আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক তৃতীয় দুনিয়াভুক্ত উন্নয়নশীল দেশগুলিতে কৃষি বিপ্লবের তাৎপর্য বৃদ্ধি পাওয়ায় বৈপ্লবিক কৃষক আন্দোলনের গুরুত্বও সমহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু "কৃষক" বলতে যেহেতু সমাজের কোন সমসত্ত্ব একক বোঝায় না, যেহেতু অভ্যন্তরীণ বিভেদকরণ কৃষক-সমাজকে সমসত্ত্বতা অর্জন করা থেকে বঞ্চিত করেছে, সেহেতু স্বাভাবিকভাবেই যে প্রশ্ন ওঠে তা হল : পৃথকীকৃত কৃষক-সমাজের বিভিন্ন স্তরের শ্রেণীচরিত্র কি ? তুলনামূলক ভাবে কোন্ কোন্ স্তরের বৈপ্লবিক সম্ভাবনা বেশি ? বৈপ্লবিক আন্দোলনে নেতৃত্বদানে কারা এগিয়ে আসে ? এইসব প্রশ্নের যথাযোগ্য উত্তরের মধ্যেই জানা যায় পুঁজিবাদ বিরোধী আন্দোলনে শ্রমিকশ্রেণীর প্রকৃত সহযোদ্ধা হতে পারে কৃষক জনগণের কোন্ স্তর।

বিপ্লবের আবশ্যিক শর্তস্বরূপ সমাজের এ ধরনের শ্রেণীবিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে মার্কসবাদের একটি নিজস্ব ঘরাণা আছে। সামগ্রিকভাবে কৃষককে শ্রেষ্ঠ হিসেবে গণ্য করতে মার্কস সংশয় প্রকাশ করলেও এঙ্গেলসের রচনায় কৃষক-সমাজের পৃথকীকরণ এবং পৃথক পৃথক অংশের শ্রেণীসত্তার, বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। তবে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের আলোকে কৃষক-সমাজের সার্থক শ্রেণীবিশ্লেষণ করেন প্রথম লেনিন এবং তারপর মাও। রাশিয়ার অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এবং চীনের জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্য

নেতৃত্বে পরিচালিত বিশ্বব্যাপী বৈপ্লবিক কৃষক আন্দোলনসমূহেরও তাত্ত্বিক হাতিয়ার হলো এই লেনিন-মাও নির্দেশিত বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ।

কিন্তু ষাটের দশক থেকে একদল পশ্চিমী ঐতিহাসিক ও সমাজ-তাত্ত্বিকের গবেষণায় অন্য সুর শোনা যেতে থাকে। অভিজ্ঞানমূলক গবেষণার মাধ্যমে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ বৈপ্লবিক কৃষক আন্দোলনসমূহের ইতিহাস ঘেঁটে তাঁরা এমন এক সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যা মার্কসীয় তত্ত্ব ও প্রয়োগের সর্বজনীন সত্যকে সরাসরি দ্বন্দ্বে আহ্বান করল। এ'দের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য হলেন হামজা আলাভি, এরিক উলফ আঁদ্রে, গুণ্ডার ফ্র্যাঙ্ক প্রমুখরা; আর তাঁদের 'সৃজনী প্রতিভা'র ফল হলো তথাকথিত 'মধ্য কৃষকের প্রকল্প'।

প্রকল্পটি ব্যাপক আকারে প্রথম প্রকাশ করেন হামজা আলাভি তাঁর বিখ্যাত 'Peasants and Revolution' প্রবন্ধে (The Socialist Register, 1965)। প্রবন্ধটির উদ্দেশ্য ছিল বৈপ্লবিক আন্দোলনে কৃষক-সমাজের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় স্তর হিসাবে মধ্য কৃষককে চিহ্নিত করা। আলাভির মতে, গ্রামীণ অর্থনৈতিক কাঠামোয় তার বিশেষ শ্রেণীগত অবস্থানের জন্যই কৃষক-সমাজের অন্যান্য অংশের তুলনায় মধ্য কৃষকের বিপ্লবী আন্দোলনে নেতৃত্বদানের সম্ভাবনা বেশি থাকে। মধ্য কৃষক বলতে তিনি ছোট জোতের মালিক স্বাধীন কৃষককে বুঝিয়েছেন। তাঁর মতে কৃষিতে সামন্ততান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী উভয় প্রকার সম্পর্ক থেকেই এই শ্রেণীর কৃষকের স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্যণীয়। সামন্ত-তান্ত্রিক শোষণ থেকে মুক্ত থাকার ফলে সে যে পরিমাণ স্বাধীনতা ও কাঠামোগত স্বাতন্ত্র্য অর্জন করে তা ক্ষুদ্র ও দরিদ্র কৃষকের তুলনায় তাকে নিজ স্বার্থ রক্ষায় অনেক বেশি সাহসী, উদ্যমী ও জঙ্গী করে তোলে। তার ধ্যান-ধারণাও ক্ষুদ্র কৃষকের অনগ্রসর ও দাসসুলভ চরিত্রের তুলনায় অনেক বেশি ঋজু। তাই সামন্ততান্ত্রিক শোষণ ও অত্যাচারের মাত্রা যখন সহ্যাতীত হয়ে ওঠে এবং পুঁজিবাদী থাবারের দাপটে স্বাধীন কৃষকের অস্তিত্বই যখন বিপন্ন হয়ে পড়ে তখন ইতিহাসের স্বাভাবিক নিয়মেই যে কৃষক অভ্যুত্থান হয় তার পুরোভাগে নেতৃত্বদানে এগিয়ে আসে এই মধ্য কৃষকেরাই, কৃষক সমাজের অন্যান্য দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষক বা ক্ষেতমজুরেরা নয়। তবে প্রচলিত ভূমি-সম্পর্কের ভাঙনের ফলে মধ্য কৃষকের লাভের চেয়ে লোকসানই যেহেতু বেশি, তাই আন্দোলনের প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত তার জঙ্গী নেতৃত্ব পরিলক্ষিত হলেও অন্তিম পরিণতি পর্যন্ত তা অটুট থাকে না।

মধ্য কৃষকের এই 'সংগ্রামী' ঐতিহ্যের প্রমাণস্বরূপ আলাভি রাশিয়া ও ও চীন উভয় দেশেরই বিপ্লবের উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, প্রাক্ বিপ্লব রাশিয়াতে গ্রামীণ অর্থনীতির ধারক ও বাহক ছিল এই মধ্য কৃষকেরাই এবং ১৯০৫ ও ১৯১৭ সালের ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ দিনগুলিতে জারসাহীর বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক আন্দোলনে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল এদেরই। অনুরূপভাবে চীন বিপ্লবেরও মূল চালিকা শক্তি ছিল নাকি চীনের মধ্য কৃষকের উদ্যম ও সংগ্রামী নেতৃত্ব। অবশ্য ঐতিহাসিক বাস্তবতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে আলভি স্পষ্টই ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, নিজস্ব শ্রেণীগত অবস্থানের জন্যই মধ্য কৃষকের বিপ্লবীয়ানা সীমিত থাকতে বাধ্য, আর সেই কারণেই আন্দোলনের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তার কেন্দ্রবিন্দু থেকে মধ্য কৃষকও ক্রমাগত পিছু হঠতে থাকে। কিন্তু 'প্রকল্পটি'র আরেক প্রবক্তা এরিক উলফ এর বক্তব্য অন্য রকম। তাঁর 'Peasant Wars in the Twentieth Century (I97I) গ্রন্থে তিনি আরো একধাপ এগিয়ে মধ্য কৃষক এবং সামন্ত শোষণ থেকে মুক্ত অন্যান্য দরিদ্র কৃষককেই কৃষক অভ্যুত্থানের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক শক্তির মূল উৎস বলে উল্লেখ করেন। তাঁর মতে মধ্য কৃষক একদিকে যেমন 'আদর্শ' কৃষকের পরম্পরা, রীতি-নীতি ও রক্ষণশীল মানসিকতার প্রতীক, অন্যদিকে তেমনি কৃষিনির্ভর সামাজিক ব্যবস্থায় গতিসঞ্চারেরও মূল উৎসস্থল সে। শ্রেণী হিসাবে অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী হলেও উলফের মতে মধ্য কৃষকই জমিদারশ্রেণীর অযাচিত হস্তক্ষেপ ও বাজার-অর্থনীতির দোদুল্যমানতার ফলে সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হয়; আর সেই কারণেই কৃষক বিদ্রোহ ও বিপ্লবী অভ্যুত্থানগুলিতে তারাই সবার চেয়ে বেশি সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। ইতিহাসে কি ঘটেছে শুধু তারই উল্লেখ করে উলফ ক্ষান্ত থাকেন নি তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, এই শ্রেণীর কৃষকের সক্রিয় অংশগ্রহণের ফলেই কৃষক বিদ্রোহ ও বিক্ষোভগুলি প্রকৃত অর্থে কার্যকরী হয়ে উঠতে পারে।

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে কৃষক আন্দোলনের সমাজতত্ত্বে পশ্চিমী গবেষকদের এই নবতম সংযোজন চিরায়ত মার্কসবাদী শ্রেণীবিশ্লেষণ পদ্ধতির পরিপন্থী। ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ও দ্বন্দ্বতত্ত্বের নিরিখে মার্কসবাদ শ্রেণীবিন্যাসের ক্ষেত্রে যে মেরুপ্রবণতার কথা উল্লেখ করে আলভি উলফের তত্ত্বে তা অনুপস্থিত। মার্কসবাদ একথাই শেখায় যে, কোন সমাজের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বসমূহের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শোষক ও শোষিত শ্রেণীসমূহেরও সামাজিক অবস্থানের পরিবর্তন ঘটে

থাকে এবং তার ফলে বৈপ্লবিক পরিস্থিতির চূড়ান্ত পর্যায়ে দোদুল্যমান শ্রেণীগুলির পক্ষে মধ্যবর্তী ও নিরপেক্ষ স্থান রক্ষা করা সম্ভব হয় না ; সমাজ-বিকাশের অমোঘ নিয়মে তাদের এক অংশকে শোষকদের শিবিরে এবং অপর অংশকে শোষিতদের শিবিরে অবশ্যই যোগ দিতে হয় ; কিন্তু দোদুল্যমানতার কারণেই তাদের পক্ষে কখনোই বিপ্লবী শিবিরের মূল নির্ণায়ক শক্তিতে পরিণত হওয়া সম্ভব নয়। লেনিন তাই তাঁর 'Development of Capitalism in Russia' গ্রন্থে দেখিয়েছিলেন যে, কেবলমাত্র জমির মালিক হওয়ার সুবাদেই মধ্য কৃষক গ্রামীণ সামাজিক কাঠামোয় স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী হয় না ; বরং গড় ব্যয়ের তুলনায় আয়ের পরিমাণ সর্বদা কম থাকে বলে তার সামাজিক অবস্থান সর্বদাই নড়বড়ে। লেনিনের মতে, কৃষিতে পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিকাশের ফলে গ্রামীণ অর্থনীতিতে যে ভাঙন দেখা দেয় তার ফলে মধ্য কৃষকের অবস্থা হয়ে ওঠে সঙ্গীন এবং শেষ পর্যন্ত একটি স্বতন্ত্র সামাজিক বর্গ হিসাবেই তার অবলুপ্তি ঘটে এবং দ্বৈত সমরে অবতীর্ণ হয় কৃষক-বুর্জোয়া ও গ্রামীণ সর্বহারার দল। এক্ষেত্রে অধিকাংশ প্রাক্তন মধ্য কৃষকের স্থান হয় গ্রামীণ সর্বহারার দলে। একথা বলাবাহুল্য যে, বিপ্লবী আন্দোলনে এই গ্রামীণ সর্বহারাদের সামিল করার কথা বললেও শ্রেণীযুদ্ধের অগ্রণী বাহিনী হিসাবে লেনিন সর্বদাই শ্রমিকশ্রেণীর নামোল্লেখ করেছেন। অতএব লেনিনীয় বিচারে বিপ্লবী আন্দোলনে মধ্য কৃষকের নেতৃত্বদানের প্রশ্নই ওঠে না।

চীনের বিপ্লবে কমিউনিস্ট দলের রণনীতি ও রণকৌশল নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে মাও সে-তুঙ চীনা সমাজের যে শ্রেণীবিশ্লেষণ করেছিলেন তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির গভীরতায় তা এক হিসাবে ক্লাসিক পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। বিশেষ করে 'Analysis of the classes in Chinese Society' (1926) নিবন্ধে মাও মধ্য কৃষকের শ্রেণীচরিত্র যেভাবে বিশ্লেষণ করেছেন তা সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। মাও মধ্য-কৃষক বলতে তাকেই বুঝিয়েছেন যার নিজস্ব জমি আছে, বা যে অংশত জমির মালিক এবং অংশত অন্যের জমিতে চাষ করে, বা যার কোনই জমি নেই, পুরোপুরিভাবে অপরের জমিতে চাষ করে, কিন্তু নিজস্ব চাষের সরঞ্জাম আছে ; এই কৃষক প্রধানতঃ নিজের শ্রমলব্ধ আয়েই জীবন নির্বাহ করে এবং সাধারণত নিজেও যেমন শ্রমশক্তি বিক্রয় করে না, তেমনি অপর কোন কৃষককেও সে শোষণ করে না। মাও-প্রদত্ত ব্যাখ্যানুযায়ী মধ্য কৃষকের সামাজিক অবস্থানই তার পেটি-বুর্জোয়াসুলভ ধ্যান-ধারণার জন্ম দেয়। ফলে

বিপ্লবে নেতৃত্বদান তো দূরের কথা, বিপ্লবকেই সে ভয় করে। বস্তুতপক্ষে এই কারণেই দরিদ্র কৃষকের বিপ্লবী সত্তা মধ্য কৃষকের তুলনায় প্রবলতর। তাই নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে চীনের শ্রমিকশ্রেণী তথা কমিউনিস্ট পার্টিও বিপ্লবী যুক্তফ্রন্টে মধ্য কৃষককে স্থান দিলেও গ্রামীণ সর্বহারাকেই সর্বদা ঘনিষ্ঠতম মিত্র হিসাবে গণ্য করেছে।

সুতরাং রুশ ও চীন বিপ্লবের যাঁরা রূপকার তাঁদের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ কোন ভাবেই 'মধ্য কৃষকের প্রকল্প'-কে সমর্থন করে না। তাহলে যেসব দেশে তখনো গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কাজ অসমাপ্ত রয়েছে, যেমন আমাদের দেশ ভারতবর্ষ, সেসব দেশে কি এই তত্ত্ব প্রযোজ্য? উল্‌ফ অবশ্য ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর তত্ত্বকে প্রামাণ্য করে তুলতে চেষ্টা করেন নি। কিন্তু আলাভি ভারতীয় কৃষকের অন্তত দুটি গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রামের প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন। সে দুটি হল: তেভাগা আন্দোলন ও তেলেঙ্গানা কৃষক অভ্যুত্থান। দুটি আন্দোলনই যে চরম ব্যর্থতার শিকার হয়েছিল তার অন্যতম কারণ হিসাবে তিনি চিহ্নিত করেন উভয় ক্ষেত্রেই আন্দোলনের উন্নত পর্যায়ে সংগ্রামের মূল স্রোত থেকে মধ্য কৃষকের বিচ্ছিন্নতাকে। ফলে তিনি তাঁর মূল তত্ত্বেরই সমর্থন সংগ্রহ করেন তেভাগা-তেলেঙ্গানার ব্যর্থতা বিশ্লেষণ থেকে।

দুই

তাহলে প্রশ্ন ওঠে: সত্যিই কি ভারতবর্ষের কৃষক আন্দোলনের ইতিহাস মধ্য কৃষকের সাফল্য বা ব্যর্থতার ইতিহাস? এ প্রশ্নের সদুত্তর পেতে হলে ভারতে কৃষক আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনা করতে হয়। আলোচনার সুবিধার্থে আমরা সংগঠিত কৃষক আন্দোলনের আদি পর্ব থেকে স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পর পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কৃষক আন্দোলনগুলির নেতৃত্বের শ্রেণীচরিত্র বিশ্লেষণের মধ্যে নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখব। এখানে সংগঠিত আন্দোলন বলতে আমরা মূলত গান্ধীবাদী পর্ব থেকে যে কৃষক আন্দোলনের সূত্রপাত হয় তার কথাই বোঝাতে চাইছি। কারণ মুঘল আমলের কৃষক বিদ্রোহগুলি বা উনবিংশ শতাব্দীর সাঁওতাল বিদ্রোহ ও নীল বিদ্রোহের মতো কৃষক অভ্যুত্থানগুলি ব্যাপক ও হিংস্র রূপ ধারণ করলেও সেগুলি প্রধানত ছিল কল্পবাদী স্বতঃস্ফূর্ত গণ-অভ্যুত্থান। নির্দিষ্ট কর্মসূচী-ভিত্তিক ও রাজনৈতিকভাবে সচেতন ও সংগঠিত কৃষক আন্দোলনের [illegible]

রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে গান্ধীর আগমনের পর থেকে। তাই বর্তমান নিবন্ধের কালও সীমাবদ্ধ থাকছে ১৯২০-৫০ সালের মধ্যে। আরো একটি বিষয় সম্পর্কেও স্বচ্ছ ধারণা থাকা প্রয়োজন। অর্থাৎ যার সামাজিক ভূমিকা নিয়ে এই বিতর্ক সেই 'মধ্য কৃষকের' সংজ্ঞা কি? এ ব্যাপারে ড্যানিয়েল থর্নারের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। থর্নার তাঁর 'The Agrarian Prospects in India (1956) গ্রন্থে গ্রামীণ শ্রেণীবিন্যাসের আদর্শ নমুনায় 'কিসান' বলে যাদের উল্লেখ করেছেন তারাই হল আমাদের আলোচিত মধ্য কৃষক, যারা মাঝারি মাপের জমির মালিক, নিজেরা জমি চাষ করে, জমি থেকে লব্ধ আয়ে যাদের ভরণ-পোষণ চলে, কিন্তু বৈধ বা প্রথাসম্মত অধিকার যাদের বৃহৎ ভূস্বামী ও জমিদারদের তুলনায় কম। থর্নারের সজ্ঞানুযায়ী বৃহৎ ভূস্বামী ও জমিদারদের অধীনস্থ সম্পন্ন প্রজাদেরও মধ্য কৃষক বলা যায়। অতএব গ্রামীণ শ্রেণী-কাঠামোর সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন স্তরে যদি অবস্থান করে যথাক্রমে জমিদারশ্রেণী ও ভূমিহীন ক্ষেতমজুরের দল, তহলে মধ্য কৃষকের স্থান হলো ধনী কৃষক ও দরিদ্র কৃষকের মধ্যবর্তী স্থানে। অবশ্য একথাও ঠিক—নীল চার্লসওয়ার্থ যেকথা বলেছেন—যে, কঠোর সংখ্যাতত্ত্ব দিয়ে সর্বদা নিক্তির ওজনে বিভিন্ন বর্গের বা শ্রেণীর সীমানা নির্দিষ্ট করা যায় না, কারণ তাদের পার্থক্যের সীমারেখা বহু ক্ষেত্রেই দেখা যায় ক্ষীণ (N. Charles Worth : 'The "middle peasant thesis" and the roots of rural agitation in India, 1914-1947', The Journal of Peasant Studies, Vol. 7, No. 3.)। তবে নিক্তির ওজনে মাপা না গেলেও থর্নার-প্রদত্ত সংজ্ঞাটি মোটামুটি গ্রহণযোগ্য এবং তারই ভিত্তিতে ভারতের কৃষক আন্দোলনে মধ্য কৃষকের ভূমিকা নিরূপণ করা সম্ভব।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই ভারতবর্ষে অর্থনৈতিক সংকট তীব্রতর হতে থাকে এবং তারই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। গান্ধীজীর নেতৃত্বে দেশব্যাপী যে গণ-আন্দোলনের জোয়ার আসে তার প্রতিফলন ঘটে কৃষক-জনতার মধ্যেও। বস্তুতপক্ষে গান্ধীজীর নেতৃত্বে পরিচালিত সত্যাগ্রহ আন্দোলন ভারতীয় কৃষকের রাজনৈতিক চেতনার মান যেভাবে উন্নত করেছিল অতীতে তেমনটি দেখা যায় নি। সেদিক থেকে গান্ধীবাদী আন্দোলন সত্যিই উল্লেখযোগ্য অবদানের অধিকারী। কিন্তু শ্রেণীসমন্বয়ের প্রবক্তারূপে গান্ধীজী সকলশ্রেণীর কৃষককে সমবেত করে সত্যাগ্রহ পরিচালনা করলেও বাস্তবে তাঁর পরিচালিত

কৃষক আন্দোলনে ধনী ও মাঝারী কৃষকের নেতৃত্বই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই-সব আন্দোলনের বিরোধী পক্ষ ছিল হয় সরকার নয় জমিদারশ্রেণী এবং প্রতিটি আন্দোলনই পরিচালিত হয়েছিল উদারনৈতিক-সংস্কারবাদী পদ্ধতিতে। সত্যাগ্রহের নীতি অনুসারে কোন একটি নির্দিষ্ট আইন অমান্যের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে বিরোধী পক্ষের কাছ থেকে কিছু সুযোগ-সুবিধা আদায় করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। সুতরাং সামন্ততান্ত্রিক ও আধা সামন্ততান্ত্রিক ভূমি সম্পর্কের মৌলিক রূপান্তর সাধন বা সরকারী প্রাধিকারকে চ্যালেঞ্জ জানানো গান্ধীবাদী আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল না। তাই ধনী বা মধ্য কৃষকের উপস্থিতি সত্ত্বেও এই আন্দোলনগুলিকে কোনভাবেই 'বৈপ্লবিক' বা 'প্রায়-বৈপ্লবিক' বলা যায় না।

প্রথমেই ধরা যাক চম্পারণ সত্যাগ্রহের (১৯১৭) কথা। ইংরেজ নীলকর-দের অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত করে গান্ধীজী সরকারকে তদন্ত কমিশন বসাতে বাধ্য করেন এবং তদন্ত কমিশনের রায়ের ফলে 'তিনকাঠিয়া' ব্যবস্থার অবসান ঘটে এবং 'সারাভাসী'র পরিমাণও কমানো হয়। ফলে কৃষকেরাও বাধ্যতামূলকভাবে নীল চাষ করা থেকে মুক্ত হয়। কিন্তু এই ব্যবস্থার ফলে যাদের নির্দিষ্ট অভিযোগ মিটেছিল তারা ছিল মধ্য কৃষক ও সাধারণ ধনী কৃষক। সত্যাগ্রহ আন্দোলন তাদের দুঃখ লাঘব করলেও জমিদার-প্রজার মৌলিক সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্ক সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন তোলারই আগ্রহ তারা বোধ করে নি।

খেদা সত্যাগ্রহেও (১৯১৮) একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। গুজরাটের খেদা জেলায় সে বছর ছিল অজন্মা। তাই কৃষকেরা খাজনা মুকুবের দাবী জানায়। সরকারের রাজস্ব বিভাগের কর্মচারীরা সে দাবী মানতে নারাজ হওয়ায় গান্ধীজীর নেতৃত্বে সত্যাগ্রহ শুরু হয় এবং রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করার হুমকি দেওয়া হয়। দেশব্যাপী প্রচারকার্যের ফলে সরকার অবশেষে নতিস্বীকার করে এবং খাজনা মুকুবের দাবী মেনে নেয়। লক্ষ্যণীয় যে, এখানেও গান্ধীজী 'পতিদার' কৃষকের দাবীর সমর্থনেই সত্যাগ্রহের ডাক দিয়েছিলেন। ভূ-সম্পত্তির মালিক এই কৃষকেরা তাদের আন্দোলনকে আগাগোড়াই নিয়ম-তান্ত্রিকতার সীমায় বেঁধে রেখেছিল এবং গরীব রায়তেরা যাতে ক্ষোভে ফেটে না পড়ে সেদিকেও বিশেষ নজর রেখেছিল।

সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ইতিহাসে বারদোলী সত্যাগ্রহ (১৯২৮) বিশেষভাবে

উল্লেখযোগ্য। গুজরাটের বারদোলী অঞ্চলে জমির দর হঠাৎ উর্ধ্বগামী হওয়ায় বৃটিশ সরকার শতকরা ২২ ভাগ রাজস্বের হার বৃদ্ধি করায় 'পতিদার' সম্প্রদায়ভুক্ত ধনী ও মধ্য কৃষকেরা এবং 'বানিয়া' সম্প্রদায়ের ভূস্বামীরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন এবং 'কর-বন্ধের' আন্দোলন শুরু করেন। গান্ধীজী, প্যাটেল, [illegible] প্রমুখ জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ের নেতাদের সাহচর্যে শ্রেণীনির্বিশেষে সমস্ত স্তরের কৃষক অহিংস সত্যাগ্রহের আদর্শে সংগ্রাম চালিয়েও শেষ পর্যন্ত সরকারের সঙ্গে একটা সমঝোতায় আসতে বাধ্য হয়। শর্ত অনুযায়ী গুজরাটের জমিদার ও বোম্বাইয়ের ব্যবসায়ীরা প্রথমে ধার্য বাড়তি রাজস্বের পুরোটাই সরকারী কোষাগারে জমা দেন এবং তারপর নিযুক্ত কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী বর্ধিত রাজস্বের হার কমানো হল ঠিকই, কিন্তু পূর্বের তুলনায় মাত্র শতকরা ৬'২৫ ভাগ রাজস্ব বাড়ানো হলো। একথা অনস্বীকার্য যে, ১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলনের গণভিত্তি রচনায় বারদোলী সত্যাগ্রহের উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল, কিন্তু এটাও অস্বীকার করা যায় না যে, এই জয় মূলত ছিল ধনী ও মধ্য কৃষকের জয়। ফলত বারদোলী সত্যাগ্রহও কৃষকজীবনের মূল সমস্যা জমিদারী প্রথা অবসানের কোন কর্মসূচী নেয় নি। সফল সত্যাগ্রহের পরেও 'দুবলা' ভূমিদাস কৃষকেরা জমিদার ও মহাজনদের হাতে আগের মতোই নিগৃহীত ও নিপীড়িত হতে থাকে, তাদের প্রতি 'পতিদার' সম্প্রদায়ের দৃষ্টি-ভঙ্গিরও কোন পরিবর্তন সূচিত হয় নি।

অযোধ্যার কৃষকসমাজ বরাবরই সংগ্রামী ঐতিহ্যের অধিকারী। বিশেষ করে বিশ ও ত্রিশের দশকে অসহযোগ আন্দোলন ও আইন অমান্য আন্দোলনের প্রভাবে সামাজিক বঞ্চনার বিরুদ্ধে অযোধ্যার কৃষক উত্তাল হয়ে ওঠে। তালুকদারদের অত্যাচারে নিপীড়িত ছোট জোতের মালিক এবং কৃষক প্রজাদের চিরন্তন সমস্যা ছিল জমিতে নিরাপত্তার অভাব। এ অবস্থায় গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো রাজস্ব ও খাজনা অত্যন্ত উঁচু হার এবং অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রির উর্ধ্বগামী দরের চাপে তাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবশে রায়বেরিলি, ফৈজাবাদ, হরদৈ ইত্যাদি জেলাগুলিতে কৃষকেরা ব্যাপক লুঠতরাজে অংশ নেয়। এই পরিস্থিতিতে জাতীয় কংগ্রেস সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনে কৃষক জনসাধারণের সমর্থনলাভের প্রত্যাশায় কৃষক অসন্তোষকে রাজনৈতিক চরিত্রদানে এগিয়ে আসে। বিশের দশকে কংগ্রেস সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে সম্পন্ন কৃষক-প্রজার জমির ভোগস্বত্ব

নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অগ্রসর হয়েছিল। এরপর ত্রিশের দশকে খাজনা বন্ধের ডাক দিয়ে কংগ্রেস জঙ্গী আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্ষম হলেও গভীর বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ঐ আন্দোলন প্রধানত জমিদার ও অকৃষক মালিকের স্বার্থে নিয়োজিত হয়েছিল। অধ্যাপক ডি. এন. ধানাগারে তাঁর 'Peasant Movement in India (1983) গ্রন্থে চমৎকার যুক্তি প্রদর্শন করে মন্তব্য করেছেন যে, মন্দাক্রান্ত অর্থনীতিতে অযোধ্যার দরিদ্র কৃষকের পক্ষে অপরের জমিতে চাষ করেও গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করা সম্ভব ছিল, কিন্তু অবাসী ও অকৃষক মালিক এবং ধনী ও মাঝারী কৃষকের পক্ষে খাজনা আদায় করা মোটেই সম্ভব ছিল না; তাই কংগ্রেসী আন্দোলনে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয়েছিল এই শ্রেণীর সম্পন্ন কৃষক ও জমিদারেরাই, গরীব চাষী নয়। এর জ্বলন্ত প্রমাণ হলো অর্থনীতির সামান্য উন্নতিতে ধনী ও মধ্য কৃষকের আন্দোলন-মুখী রাজনীতির তুলনায় সংস্কারবাদী সাংবিধানিক রাজনীতিতে অধিকতর আগ্রহ প্রকাশ, যার অবশ্যম্ভাবী প্রতিফলন আমরা কংগ্রেসের রাজনীতিতেও লক্ষ্য করি।

অতএব, গান্ধীজী পরিচালিত কৃষক আন্দোলনগুলিতে আমরা এমন কোন তথ্যের সন্ধান পাই না যার ভিত্তিতে 'মধ্য কৃষকের প্রকল্প'টি সমর্থনযোগ্য হয়ে উঠতে পারে। একথা ঠিক যে, এই আন্দোলনগুলি হয় মধ্য কৃষকের নেতৃত্বে সংগঠিত হয়েছিল, নতুবা তাদের স্বার্থেই পরিচালিত হয়েছিল, কিন্তু কোন সময়েই তারা সংস্কারবাদ ও সাংবিধানিকতার সীমা অতিক্রম করে বৈপ্লবিক আন্দোলনে পরিণত হয় নি। বরং যখনই তেমন কোন সম্ভাবনা দেখা গেছে তখনই গান্ধীজী অহিংসার আদর্শের অজুহাতে হয় তার রাশ টেনে ধরেছেন, নয়ত তাকে প্রত্যাহারই করে নিয়েছেন।

তিন

গান্ধীবাদী পর্বে একমাত্র যে আন্দোলনকে প্রকৃত অর্থেই সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বলা যায় সেটি হলো মোপলা কৃষক বিদ্রোহ (১৯২১)। এই ঐতিহাসিক সংগ্রামে দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষকের নেতৃত্ব ছিল অবিসংবাদিত। প্রায় দেড় শতাধিক বৎসরের বঞ্চনা ও নিপীড়ন সশস্ত্র বিদ্রোহে ফেটে পড়ে এবং ভাবলে আশ্চর্য হতে হয় যে, প্রবল পরাক্রান্ত বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের দমন-পীড়নকে উপেক্ষা করে মোপলা কৃষকেরা মাসাধিক

উপকূলের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রায় তিনমাস নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল। নাম্বুদ্রি ব্রাহ্মণ, নায়ার যোদ্ধা, জেন্‌সি পুরোহিত প্রমুখের মালিকানাধীন জমিতে 'ভেরুম্‌পোত্তাম্‌দার' নামে ভূমিহীন কৃষকেরা কারণে-অকারণে জমি থেকে উচ্ছেদ, চড়া হারে রাজস্ব বৃদ্ধি এবং প্রজাসত্বের নিরাপত্তা হীনতার শিকার হতে হতে প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়ে; রেলপথ, ডাকঘর, ব্যাঙ্ক, থানা, জমিদার বাড়ী, এক কথায় বৃটিশ রাজের যাবতীয় প্রতীক চিহ্নের বিরুদ্ধে তারা সশস্ত্র যুদ্ধ ঘোষণা করে। নানা কারণে মোপলা কৃষকদের বিদ্রোহ সাম্প্রদায়িক রূপ নিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সাম্প্রদায়িক মনোভাবই আন্দোলনের মূল রোগ ছিল না। সাম্প্রদায়িকতা নয়, কল্পবাদী চরিত্রই, মোপলা বিদ্রোহকে বিশিষ্টতা দান করেছে। কৃষক-সমাজের সবচেয়ে নির্যাতিত অংশের এই মহান সংগ্রাম এমন একটি সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিল যেখানে কোন ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকবে না, থাকবে না কোন নির্যাতনকারী পুলিশ বাহিনী, ন্যায়বিচারে প্রহসন ও গরীবের রক্তচোষা ব্যয়বহুল মামলা-মোকদ্দমা। এ ধরনের সমভোগবাদী আমূল পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা নিঃসন্দেহে ছিল আন্দোলনের শ্রেণীচরিত্রের ফল, যা ধনী ও মধ্য কৃষকের নেতৃত্বে পরিচালিত অন্য কোন সমকালীন কৃষক আন্দোলনে পরিলক্ষিত হয় নি। দুর্ভাগ্যবশতঃ উপযুক্ত সংগঠন, নেতৃত্ব ও মতাদর্শের অভাবে মোপলা বিদ্রোহ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। কিন্তু তার বৈপ্লবিক সম্ভাবনা আর কিছু না হোক, 'মধ্যে কৃষকের প্রকল্পকে যে নস্যাৎ করে সে বিষয়ে কারো দ্বিমত থাকতে পারে না।

মোপলা কৃষক বিদ্রোহ এই শিক্ষাই দিয়েছিল যে, সামন্ততান্ত্রিক ও ঔপনিবেশিক শোষণের শৃঙ্খল থেকে কৃষকের যথার্থ মুক্তির পথ নির্দেশ করতে পারে একমাত্র সাচ্চা বৈপ্লবিক সংগঠন, নেতৃত্ব ও মতাদর্শ। ঐতিহাসিকভাবে তাই এটা প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদই হতে পারে এই বৈপ্লবিক মতাদর্শের ভিত্তি। সেক্ষেত্রে সেই কাঙ্ক্ষিত বৈপ্লবিক সংগঠন অবশ্যই হবে শ্রমিকশ্রেণীর নিজস্ব রাজনৈতিক দল, কমিউনিস্ট পার্টি। বস্তুতপক্ষে, ওয়ার্কার্স, এ্যাণ্ড পীজ্যাণ্টস পার্টি, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও সারা ভারত কিসান সভার নেতৃত্বেই মধ্য, দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষকদের বৈপ্লবিক মতাদর্শে দীক্ষিত করার প্রথম যথার্থ প্রয়াস নেওয়া হয় এবং আন্দোলনের বিভিন্ন পর্বে যে পরিমাণে কৃষক সমাজের নিম্নবর্গের নেতৃত্ব সংহত হয় সেই পরিমাণেই

কৃষকের মুক্তিসংগ্রাম বৈপ্লবিক চরিত্র অর্জন করতে থাকে। পরাধীন ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা বৈপ্লবিক সম্ভাবনাপূর্ণ কৃষকসংগ্রাম দুটিই এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বলাবাহুল্য, আন্দোলন দুটি হলো বাংলাদেশের তেভাগা আন্দোলন (১৯৪৬-৪৭) এবং তেলেঙ্গানা বিদ্রোহ (১৯৪৬-৫১)।

একথা আজ আর কারও অবিদিত নেই যে, অবৈধ ঘোষিত হওয়ার ফলে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রকাশ্য রাজনৈতিক আন্দোলনের প্ল্যাটফর্ম হিসাবে শ্রমিক ও কৃষক দল' গঠন করেছিল। কিন্তু এই দলের উদ্যোগে বিচ্ছিন্নভাবে এখানে সেখানে কৃষক আন্দোলন পরিচালিত হলেও বিভিন্ন কারণে কৃষকের নিজস্ব বৈপ্লবিক সংগঠন গড়ে উঠতে বিলম্ব ঘটে। প্রথমত, প্রলেতারীয় একনায়কত্বের আদর্শকে যান্ত্রিকভাবে অনুসরণ করে শ্রমিক কৃষক দল কৃষকের তুলনায়, শ্রমিকশ্রেণীকেই সংঘবদ্ধ করার দিকে অধিকতর মনোনিবেশ করেছিল। দ্বিতীয়ত কৃষক-সমাজের শ্রেণীবিশ্লেষণও যথাযথভাবে করতে ব্যর্থ হওয়ার ফলে শ্রমিক কৃষক দলে ধনী, মধ্য ও দরিদ্র, সকল স্তরের কৃষকদেরই সমাবেশ ঘটে এই কারণেই কৃষি-সমস্যার মোকাবিলায় দল কোন বলিষ্ঠ নীতি অনুসরণ করতে পারে নি। প্রসঙ্গত ১৯২৮ সালের বারদোলী সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণের প্রশ্নে দলের দোদুল্যমানতার ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তৃতীয়ত, কর্মসূচী নির্ধারণের ক্ষেত্রেও এই দোদুল্যমানতা দলের অন্যতম দুর্বল দিক ছিল। সম্ভবত এই কারণেই দল একদিকে যেমন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, রায়তওয়ারী ব্যবস্থা ও তালুকদারী ব্যবস্থার বিলোপসাধন করে সমস্ত চাষযোগ্য জমির জাতীয়করণ ও প্রকৃত কৃষকদের মধ্যে তা বণ্টন করার দাবী জানায়, অন্যদিকে তেমনি জমিতে কৃষকের ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার প্রতিষ্ঠা ও কৃষিজ আয়ের উপর ক্রমো আয়কর ধার্যের দাবিও উত্থাপন করে। অবশ্য এসব দুর্বলতা আলোচনা প্রসঙ্গে একথা ও মনে রাখা দরকার যে, সরকারের প্রচণ্ড দমন-পীড়ন নীতিও দলের পক্ষে মতাদর্শগত বিশুদ্ধতা বজায় রাখার মস্ত বড় প্রতিবন্ধক ছিল।

তবে ত্রিশের দশক থেকেই কমিন্টার্নের সহযোগিতায় ও নিজস্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কমিউনিস্ট পার্টি ভারতে কৃষি বিপ্লবের মূল উদ্দেশ্য ও কর্তব্য সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণায় উপনীত হতে থাকে। নবোদ্ভূত চেতনার ফলে সারা ভারত কিসান সভার প্রতিষ্ঠা। সংগ্রামী নেতৃত্বের উদ্যোগে কিসান

সভা অচিরেই অস্থায়ী কৃষক-প্রজা ভাগচাষী, ও দরিদ্র ভূমিহীন কৃষকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনে সক্ষম হয়। একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, সংগঠনের শ্রেণীগত ভিত্তির রূপান্তরসাধনের ফলেই কমিউনিস্ট পার্টি ও কিসান সভার পক্ষে চল্লিশের দশকে ব্যাপক বৈপ্লবিক কৃষক অভ্যুত্থান ঘটানো সম্ভবপর হয়েছিল।' 'তেভাগা' ও 'তেলেঙ্গানা' তারই দুটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

গান্ধীবাদী নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের নিস্তরঙ্গ ভাঁটার মুখে উত্তরবঙ্গের কৃষকেরা তেভাগার ডাকে আন্দোলনের জোয়ার এনেছিল। দিনাজপুর জেলার আটোয়ারী গ্রামে যার সূত্রপাত কয়েকমাস মধ্যেই তা অন্তত এগারটি জেলায় প্লাবন নিয়ে আসে। প্রায় এক হাজার কিসান সভা কর্মী কারারুদ্ধ হন, ক্ষিপ্ত কৃষক-জনতা জমিদারের কাছারি দখল করার সঙ্গে সঙ্গে ডাকঘর, থানা ইত্যাদিও আক্রমণ করে। বিভিন্ন স্থানে রাষ্ট্রশক্তির ভাড়াটে পুলিশবাহিনীর সঙ্গে তারা সশস্ত্র সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। ১২৪৬ সনের ৮ই ডিসেম্বর হাজংয়ের পাঁচ হাজার কৃষক যে বিপ্লবী বীরত্ব দেখিয়েছিল সংগ্রামী ইতিহাসের পাতায় তা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। সুতরাং বিপ্লবীয়ানার দিক থেকে 'তেভাগা' যে পূর্ববর্তী সমস্ত আন্দোলন থেকে গুণগতভাবে পৃথক ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এবং এটাও ঐতিহাসিক সত্য যে, কমিউনিস্ট পার্টি তার কিসান সভার মাধ্যমে প্রায় সমস্ত ভাগচাষীকে ঐক্যবদ্ধ করতে পেরেছিল বলেই এই আন্দোলন বৈপ্লবিক চরিত্র অর্জন করেছিল। তবে তার বাস্তব ভিত্তিও ছিল; ত্রিশের দশকের মন্দা অর্থনীতি এবং চল্লিশের দশকের দুর্ভিক্ষ বর্গাদারী শোষণকে যে চরম সীমায় নিয়ে গিয়েছিল তার ফলেই জমিদার বা জোতদারকে দেয় খাজনার পরিমাণ ফসলের অর্ধাংশ থেকে এক-তৃতীয়াংশেনামিয়ে আনার দাবিতে জমির নিরাপত্তাহীন ভাগচাষীদের ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব হয়েছিল।

তেভাগা আন্দোলনের প্রাথমিক সাফল্য অবশ্য দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। প্রায় বিনা বাধায় ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ বা কোন কোন ক্ষেত্রে পুরোটাই কেটে নিতে পারলেও জমি বা ফসলের ওপর অধিকার কায়েম করার ক্ষমতা কৃষকদের ছিল না; কারণ ফসল দখলের সীমিত উদ্দেশ্য নিয়েই আন্দোলন সংগঠিত করা হয়েছিল, বর্গাদারী শোষণের মূল ভিত্তি সামন্ততান্ত্রিক ভূমিসম্পর্ক ধ্বংস করার জন্য অবশ্যই নয়, কিন্তু এই অর্থনীতিবাদী সীমিত আন্দোলনেও মধ্য কৃষকদের ভূমিকা ছিল বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কারণ মধ্য কৃষকেরা নিজেরাই ছিল

ছোট জোতদার ; বর্গাদার নিয়োগ করে তারা জমিতে চাষ করাত। ফলে 'তেভাগা' আন্দোলনে তাদের অংশগ্রহণের বা নেতৃত্বদানের কোন প্রশ্নই ওঠে না। বরং কমিউনিস্টদের সমর্থক বা বন্ধুভাবাপন্ন ব্যক্তির রূপ ধরে জোতদার তথা মধ্য কৃষকের যে অংশ প্রাথমিক পর্যায়ে আন্দোলনে সামিল হয়েছিল, পরবর্তী স্তরে তারাই নানারকম বিভেদ, অনৈক্য ও দোদুল্যমানতার জন্ম দিয়ে আন্দোলনকে দুর্বল করে দেয়।

তেভাগা আন্দোলনের পর কমিউনিস্ট আন্দোলনের পীঠস্থান হয়ে ওঠে অন্ধ্র। তেলেঙ্গানায় শুরু হয় কৃষক মুক্তি সংগ্রামের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক জায়গীরদারী ব্যবস্থায় 'ডেশি' ও 'ভাগেলা'র নামে সামন্ত জমিদার, 'দেশমুখ' ও 'দেশপাণ্ডে'দের দল অন্ত্যজ উপজাতি ও ভূমিহীন কৃষকের ওপর যে শোষণ ও নির্যাতনব্যবস্থা চাপিয়ে দিয়েছিল তার বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে তেলেঙ্গানার বীর কৃষকেরা। সামন্ততন্ত্র ও নিজামশাহী-বিরোধী এই সংগ্রাম কালক্রমে স্বাধীন ভারতীয় রাষ্ট্রের রক্ষিবাহিনী পুলিশ ও মিলিটারীর বিরুদ্ধে কৃষক জনসাধারণের গেরিলা যুদ্ধের রূপ পরিগ্রহ করে। এর পরিণতি-স্বরূপ সংগ্রামের চরম সাফল্যের দিনে বিপ্লবী কৃষকেরা প্রায় চার হাজার গ্রামে 'সোভিয়েত'-স্বরাজও প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল।

তেলেঙ্গানা আন্দোলনের প্রাথমিক পর্বে সর্বস্তরের কৃষকই গ্রামীণ 'সঙ্ঘম'-গুলিতে সমবেত হয়েছিল এবং প্রাথমিক সাফল্যের মূলেও ছিল এই ব্যাপক শ্রেণী-সমন্বয়। কিন্তু উচ্চতর পর্যায়ে উত্তরণের সঙ্গে সঙ্গে ধনী ও মধ্য কৃষকেরা আন্দোলনের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। 'সঙ্ঘম' বা গ্রাম-সমিতির নেতৃত্বে জমি দখল ও ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে সেই জমি বণ্টনের কর্মসূচীতে যখন বড় বড় জমিদারের সঙ্গে সঙ্গে ধনী ও মাঝারি কৃষকের জমি দখলেরও প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তখন থেকেই উচ্চবিত্ত কৃষকেরা আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়াতে থাকে। এর ফলে সামন্ত শক্তি ও বুর্জোয়া রাষ্ট্রের রক্ষীবাহিনীর প্রতিবিপ্লবী আক্রমণের মুখে কেবল-মাত্র ক্ষুদ্র, প্রজাস্বত্বহীন, দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষকদেরই বিপ্লবের শিখা প্রজ্বলিত রাখতে হয়। স্বল্পকালের জন্য হলেও যে বৈপ্লবিক রাষ্ট্রশক্তির আবির্ভাব ঘটেছিল তার মূলেও ছিল এই কৃষক-জনগণের মরণপন সংগ্রাম ও গভীর আত্মত্যাগ। বস্তুতপক্ষে, শহরাঞ্চলের শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে উপযুক্ত বৈপ্লবিক সমর্থন সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হওয়ার জন্যই তেলেঙ্গানা অভ্যুত্থান রাষ্ট্রশক্তির প্রতি

বিপ্লবী আক্রমণে পর্যুদস্ত হয়ে যায়। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে আন্দোলনের চরম পর্যায়ে উপজাতীয় কৃষক-প্রজা ও ভূমিহীন ক্ষেতমজুরেরাই উদ্বৃত্ত জমি দখল ও বণ্টনের মাধ্যমে সামন্ততন্ত্র ধ্বংসের কর্মসূচী অব্যাহত রেখেছিল।

চার

সুতরাং বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের কৃষক আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনা করে 'মধ্যকৃষকের প্রকল্প'টির সারবত্তা খুঁজে পাওয়া সত্যিই কঠিন। আমাদের আলোচ্য কৃষক সংগ্রামগুলিকে মোটামুটি দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। কতকগুলি আন্দোলন, বিশেষত গান্ধীবাদী আন্দোলনগুলি মূলতঃ ছিল উদারনৈতিক-সংস্কারবাদী। এই আন্দোলনগুলিতে ধনী ও মাঝারি কৃষকের নেতৃত্ব অবশ্যই সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু সেই কারণেই তাদের পক্ষে সামন্ততন্ত্র-বিরোধী বৈপ্লবিক গণ-আন্দোলনে পরিণত হওয়া সম্ভব হয় নি। দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত আন্দোলনগুলির মধ্যে পড়ে মোপলা, তেভাগা ও তেলেঙ্গানা কৃষক অভ্যুত্থানগুলি। যে কোন অর্থেই এগুলিকে বৈপ্লবিক বা প্রায়-বৈপ্লবিক আন্দোলন বলে অবশ্যই স্বীকার করে নিতে হবে। অথচ লক্ষ্যণীয় যে, ধনী ও মাঝারি কৃষকের অবদান এক্ষেত্রে ছিল যৎসামান্যই। যাদের গৌরবোজ্জ্বল সংগ্রামে এই আন্দোলনগুলি মহনীয়তা অর্জন করেছিল তারা প্রকৃত অর্থেই ছিল নিম্নবর্গের কৃষক। সত্যি কথা বলতে কি, যখন থেকে ভারতের কৃষক-সমাজ সাম্যবাদী আদর্শে উদ্বুদ্ধ হতে থাকে এবং যখন থেকে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রমিক-কৃষক যৌথ সংগ্রামের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার প্রচেষ্টা কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে অনুসৃত হতে থাকে, তখন থেকেই ভারতীয় কৃষক স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের স্তর অতিক্রম করে সচেতন, সুসংগঠিত রাজনৈতিক আন্দোলনের পথে এগিয়ে এসেছে।

যে কথা দিয়ে আমরা শুরু করেছিলাম সে কথাতেই ফিরে যাওয়া যাক। কথা হচ্ছিল মধ্য কৃষকের ভূমিকা নিয়ে। আমাদের ইতিহাস পরিক্রমা একথা অন্তত জোরালোভাবে প্রতিষ্ঠা করেছে যে, মধ্য কৃষক নিজের জন্য কোন স্বাধীন ঐতিহাসিক ভূমিকা অর্জন করতে পারে নি। শ্রেণী হিসাবে তার সমরূপতা যেমন সন্দেহের ঊর্ধ্বে নয়, তেমনি সামাজিক-অর্থনৈতিক মেরুপ্রবণতার চাপের

মুখে তার সামাজিক অবস্থান সর্বদাই দোদুল্যমান থেকেছে। কৃষি-অর্থনীতির উন্নতি অবনতির সঙ্গে সঙ্গে তার অবস্থান ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতো ক্রমান্বয়িক স্থান পরিবর্তন করেছে। সুতরাং অধ্যাপক ধানাগারের সঙ্গে একমত হয়ে আমরাও বলতে পারি যে, মধ্য কৃষকের কাঠামোগত স্বাতন্ত্র্যের যে ধারণা প্রচার করা হয়েছে তা নিছক কল্পনাপ্রসূত, বাস্তব অর্থনীতির সঙ্গে তার যোগাযোগ খুবই ক্ষীণ। অতএব, এই স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিতে তার যে সম্ভাব্য বিপ্লবী চরিত্রের কথা বলা হয় তাকেও যুক্তিসম্মত বলে মেনে নেওয়া যায় না। আসলে 'মধ্য কৃষকের প্রকল্প' রচনার মাধ্যমে ইতিহাসকে বিকৃত করার বুর্জোয়া কৌশলকেই প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে। কৃষক সমাজের কোন্ অংশের বৈপ্লবিক সমর্থনের উপর শ্রমিকশ্রেণী নির্ভর করতে পারে সেই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নেই বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে চেষ্টা করা হয়েছে। অথচ চীন বা রাশিয়ার প্রসঙ্গ না তুলেও কেবলমাত্র ভারতবর্ষের কৃষক আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই যে মধ্য কৃষকের স্বরূপটি ধরা পড়ে তা আমরা দেখেছি। কমিউনিস্ট নেতৃত্বে পরিচালিত বামপন্থী কৃষক-আন্দোলনসমূহের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি অনুধাবন করলেও আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা পেতে পারি। কারণ গ্রামীণ সর্বহারার পরিবর্তে যখনই অপর কোন বিশেষ সুবিধাভোগী অংশের ওপর কৃষক সংগঠনের ভিত্তি রচনা করতে চেষ্টা করা হয়েছে তখনই আন্দোলনে সংস্কারবাদী বিচ্যুতি ও দোদুল্যমানতা দেখা দিয়েছে। অন্যথায় প্রকৃত বিপ্লবী অংশের ওপর নির্ভর করে যে যথার্থ বিপ্লবী চেতনায় শুধু কৃষক-সমাজকেই নয়, সমগ্র জনগণকেও উজ্জীবিত করা যায়, তেভাগা-তেলেঙ্গানার রক্তাক্ত ইতিহাস তার জ্বলন্ত উদাহরণ।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আলোকে মুর্শিদাবাদ

১৯০৫-১৯৪৭

বিষাণ কুমার গুপ্ত

ভারতবর্ষের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জগতের একটি উল্লেখ-যোগ্য অধ্যায় হিসাবে "সাম্প্রদায়িকতা" সুদীর্ঘকাল আমাদের কাছে পরিচিত। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে নানা আর্থ-সামাজিক কারণকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক সংঘাত ভারত ইতিহাসের একটি চিরাচরিত ঘটনা। যদিও এই সংঘাতের মধ্যে মিলনের ঘটনাও পাশাপাশি আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হিসাবে প্রতীয়মান। শ্রেণীবিভক্ত ও সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণে জর্জরিত ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক শক্তির মাথাচড়া দিয়ে ওঠার ঘটনা খুবই স্বাভাবিক। কারণ শ্রেণীস্বার্থেই দেশী ও বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী এই বিষাক্ত ও মারাত্মক সাম্প্রদায়িক শক্তিকে উসকে দিয়ে তাদের শাসন ও শোষণ চালিয়ে যান অবলীলাক্রমে। কিন্তু যখন দেখা যায় ঐ অশুভশক্তির বিরুদ্ধে পাশাপাশি একটা পাল্টা শুভ শক্তি সৃষ্টি হচ্ছে এবং তা প্রতিরোধ গড়ে তুলছে—তখন তা নিজ বৈশিষ্ট্যেই দেশের ইতিহাসে ভাস্বর হয়ে থাকে।

সাম্প্রদায়িকতা ও সাম্প্রদায়িক শক্তি বলতে আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা আধুনিক ভারতবর্ষের দুই বৃহৎ সম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলমানদেরই বুঝিয়েছি। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষদিক থেকেই এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘাত শুরু হয়েছিল এবং বৃটিশরাজত্বে তা আরও সুপরিকল্পিত রূপ লাভ করে—একথা পাঠকবর্গের সকলেরই জানা ঘটনা। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় আন্দোলন যখন দানা বাঁধতে শুরু করে সাম্প্রদায়িক শক্তিকে তখন উসকে দেওয়া হয় শুরু। হয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পশ্চাতের মূল কারণ শুধু ধর্মীয় নয়, অন্য কিছু। সকল সতর্ক পর্যবেক্ষকগণই একথা স্বীকার করবেন যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মূলে থাকে অর্থনৈতিক কারণ এবং কিছু অন্য ধান্দা।

এই প্রেক্ষাপটেই আমরা আলোচ্য প্রবন্ধে বেছে নিয়েছি ভারত তথা অবিভক্ত বাংলাদেশের এক গুরুত্বপূর্ণ জেলা মুর্শিদাবাদকে—যা দেশী ও বিদেশী শাসকবর্গকে আকৃষ্ট করেছিল নানা কারণে এবং যার ফলে একদা বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার রাজধানী হিসাবে স্বীকৃতিলাভ করে।

মুর্শিদাবাদ জেলার বৈশিষ্ট্য হল এই যে সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী শক্তি এই জেলায় বরাবর একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। যখনই সাম্প্রদায়িকতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, শুভবুদ্ধির প্রতীক হিসাবে অসাম্প্রদায়িক শক্তি এগিয়ে এসেছে তা প্রতিরোধ করতে। সাম্প্রতিককালের ভারতবর্ষের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে তাই শ্রদ্ধার সাথেই স্মরণ করি সেই শুভশক্তিকে।

অবিভক্ত বাংলাদেশের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত মুর্শিদাবাদ জেলার ভৌগলিক আয়তন ২০৯৪৫ বর্গমাইল। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারী অনুসারে এই জেলার লোকসংখ্যা ছিল ১২,২৪,১৮৯; ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ১৩,৭০,৬৭৭; ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে ১৬,৪০,৫৩০ এবং ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১৭,১৫,৭৫৯। এর মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা ৭,৫৬,২১৮ অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার ৪৪·৬০% এবং মুসলমানদের সংখ্যা ৯,৪৭,৮১৫, অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার ৫৫·২৪%।(১)

এই যুগের মুর্শিদাবাদ জেলার আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট আলোচনা করলে দেখা যায় যে জেলার অর্থনীতি ছিল সম্পূর্ণরূপে কৃষিভিত্তিক। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তোত্তর শাসন ও শোষণ জেলার অর্থনীতিকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করেছিল। দারিদ্র্য নানান ব্যধি, ও মহামারী ছিল এই জেলার ঘনিষ্ঠ সহযোগী। ফলতঃ শিক্ষা-দীক্ষায় প্রসার মোটেই ঘটেনি। অবিভক্ত বাংলার অন্যান্য উন্নত জেলার শিক্ষা ও শিক্ষিতের হারের সঙ্গে এই জেলার অবস্থার তুলনা করলে এই শোচনীয় অবস্থা সহজেই ধরা পড়ে। ১৯১১ সালের আদমসুমারীর রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে যে মুর্শিদাবাদ জেলার লোকসংখ্যার মাত্র ৬ শতাংশ মানুষ সাক্ষরতা জ্ঞানসম্পন্ন, অর্থাৎ তারা একটি চিঠি লিখতে বা পড়তে পারে। কিন্তু সেই সময় বাংলার অন্যান্য সকল জেলার গড় শিক্ষিতের হার ছিল ৮ শতাংশ। অপরদিকে মুর্শিদাবাদ জেলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের শিক্ষার হার ছিল আরও শোচনীয়। শিক্ষিত হিন্দুর সংখ্যা ছিল ৫৬,৩৪৩ এবং শিক্ষিত মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ২২,৩১২। অর্থাৎ প্রতি দশজন শিক্ষিত হিন্দু প্রতি চারজন শিক্ষিত

মুসলমান।(২) পরবর্তীকালে অর্থাৎ ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের রিপোর্ট পর্যন্ত মুর্শিদাবাদ জেলার মুসলমানদের শিক্ষার হার হিন্দু সম্প্রদায় অপেক্ষা অনেক কম ছিল। শতকরা হিসাবে মুর্শিদাবাদ জেলার শিক্ষিতের হার হলো—

১৯১১ খৃষ্টাব্দ—৫·৯১%
১৯২১ খৃষ্টাব্দ—৭·২৪%
১৯৩১ খৃষ্টাব্দ—৫·২৫%
১৯৪১ খৃষ্টাব্দ—হিসাব পাওয়া যায় নি।
(কারণ সরকারী Records নষ্ট হয়ে গেছে)
১৯৫১ খৃষ্টাব্দ—১২·৬৮%

সুতরাং এইরূপ একটি পিছিয়েপড়া ও সামন্ত শোষণে জর্জরিত কৃষি-ভিত্তিক মুর্শিদাবাদ জেলার সাংস্কৃতিক মানও ছিল ভীষণভাবে অনুন্নত এবং তারই ফলশ্রুতি হিসাবে জেলার মানুষের রাজনৈতিক চেতনার স্তরও ছিল নিম্নমুখী। কিছু রাজা, মহারাজা নবাব বা কিছু জমিদার ও সামন্তপ্রভুর দল এই জেলাকে সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করতেন সেই যুগে। সমাজ, রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক জীবন সবই ছিল তাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে। জেলার প্রধান রাজ-নৈতিক দলগুলি, যথা কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা ও মুসলিম লীগকে তারাই নিজ নিয়ন্ত্রণে রেখেছিলেন। যদিও অসহযোগ আন্দোলনের সময় থেকে কিছু কিছু মধ্যবিত্ত মানুষ রাজনীতি বা সমাজজীবনের পাদপ্রদীপে আসতে শুরু করেন, তবুও সামন্তপ্রভুদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাওয়ার নিদর্শন খুবই কম ঘটেছে সেই যুগে।(৪) এই জেলায় বামপন্থী রাজনীতির জন্ম ত্রিশের দশকের শেষদিকে। কিন্তু তা ছিল নিতান্তই দুর্বল।

স্বাধীনতাপূর্ব যুগে এই জেলায় সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবিরোধী লড়াই কোনদিনই ঐক্যবদ্ধভাবে সংগঠিত হয় নি—যা হয়েছিল মেদিনীপুর, ২৪ পরগণা, দিনাজপুর, ময়মনসিংহ, নদীয়া বা রংপুর জেলায়।(৫)

এইরূপ এক আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে যদি আমরা মুর্শিদাবাদ জেলার মুসলিম রাজনীতি আলোচনা করি তাহলে দেখা যাবে যে—অর্থ-নৈতিক ক্ষেত্রে মুর্শিদাবাদ জেলার মুসলমান সম্প্রদায় ছিলেন হিন্দু অপেক্ষা অনেক পিছনে। তাদের জনসংখ্যার বেশির ভাগই ছিলেন গরীব কৃষক, ক্ষেত মজুর অথবা ভাগচাষী। যদিও স্বাধীনতা পূর্ব যুগে এই জেলায় কিছু মুসলিম জমিদার ছিলেন, কিন্তু হিন্দু জমিদারদের তুলনায় তাদের প্রভাব

ছিল নিতান্তই সামান্য। জেলার সরকারী অফিসগুলিতে মুসলিম কর্মচারী-দের সংখ্যা ছিল খুবই কম। স্কুল-কলেজগুলিতে মুসলিম শিক্ষকদের সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য।(৬) সর্বোপরি সেই যুগে মুর্শিদাবাদ জেলার একমাত্র কলেজ বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের এক পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে ১৯২০-১৯৪৭ পর্যন্ত এই কলেজ থেকে স্নাতক হয়েছিলেন মাত্র ১৪২ জন মুসলিম যুবক।(৭) এদের এক বিরাট অংশই সম্ভবতঃ অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে আসতেন। জেলার স্কুলগুলির তৎকালীন পরিসংখ্যান থেকেও দেখা যাবে যে তুলনামূলকভাবে খুব কমসংখ্যক মুসলিম ছাত্রই ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাশ করতেন।(৮) সুতরাং সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে জেলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সমাজ সংখ্যালঘিষ্ঠ হিন্দুসমাজ অপেক্ষা অনেক পিছিয়ে ছিল। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ছাড়া সারা ভারতবর্ষের একই চেহারা লক্ষণীয়।(৯)

সর্বভারতীয় বা রাজ্যস্তরের মুসলিম লীগ নেতৃত্ব মুসলিমদের সাম্প্রদায়িক মনোভাবে উস্কানি দিয়ে হিন্দুবিরোধী বা কংগ্রেসবিরোধী যে জেহাদ তুলে তাদের স্বার্থসিদ্ধ করতে চেয়েছিলেন, তার ঢেউ মুর্শিদাবাদ জেলাতেও এসে পৌঁছেছিল।

এই জেলা নিঃসন্দেহে রাজ্য মুসলিম লীগের একটি শক্তিশালী ঘাঁটি হিসাবে পরিচিত ছিল। পাশাপাশি হিন্দু মহাসভাও সেযুগে ছিল মুর্শিদাবাদ জেলার শক্তিশালী রাজনৈতিক দল। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, মহারাজকুমার শ্রীশচন্দ্র নন্দীর মত ব্যক্তিত্ব ছিলেন তাদের মূল পৃষ্ঠপোষক। তিরিশের দশকে আর, এস এস এর (R.S.S.) প্রতিষ্ঠাতা গুরু গোলওয়ালকর জেলার সদর শহর বহরমপুরের পার্শ্ববর্তী সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে বেশ কয়েক বছর কাটিয়ে যান ছাত্র হিসাবে।(১০) ১৯৩০ ও ১৯৪০-এর দশকে বঙ্গীয় বিধান পরিষদ ও বঙ্গীয় বিধানসভার বিভিন্ন নির্বাচনে দেখা যায় যে মুর্শিদাবাদ জেলার জাতীয়তাবাদী বা নির্দল মুসলিম প্রার্থীদের পরাজিত করে বেশীর ভাগ সময়ই মুসলিম লীগ প্রার্থীরা জয়লাভ করেন। কেবল ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে মৌলভী আব্দুস সামাদ (কংগ্রেস) এবং ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ খোদাবক্স (নির্দল) জয়লাভ করতে পেরেছিলেন মুসলিম লীগ প্রার্থীদের পরাজিত করে। ফারহাদ মুর্তাজা রেজা চৌধুরী, আব্দুল বারী, সাহেবজাদা কাজেম আলী মির্জা প্রমুখ সাম্প্রদায়িক নেতৃবৃন্দ

বারবার জয়লাভ করেছেন।(১১) সাইমন কমিশন আর স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলীর তত্ত্বকে ধন্যবাদ যে তারা তাদের উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করতে সক্ষম হয়েছিলেন এক্ষেত্রে। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মুর্শিদাবাদ জেলার মুসলিম লীগের সর্বোচ্চ নেতা ছিলেন আবদুল বারী। প্রসঙ্গক্রমে সাবওয়াৎ হোসেন আল কাদেরী বা মৌলভী আবদুল গনির নামও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এরা সকলেই মধ্যবিত্ত মানুষ এবং পেশায় আইনজীবী ছিলেন। ১৯৩৭ সালের বিধান-সভার নির্বাচনে আবদুল বারী বহরমপুর মুসলিম কেন্দ্র থেকে বিনা প্রতি-দ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছিলেন। কাজেই মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে তার জনপ্রিয়তার পরিচয় সহজেই পাওয়া যায়। তিনি একবার রাজ্য মুসলিম লীগের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে বারীসাহেব হঠাৎ মারা যান এবং উপনির্বাচনে সেই কেন্দ্র থেকে সৈয়দ বদরুদ্দোজা জয়লাভ করেন।(১২)

মুর্শিদাবাদ জেলায় স্বাধীনতা-পূর্ব যুগে সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী মানসিকতা সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে জেলার সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলি সম্পর্কেও কিছুটা প্রাথমিক আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা আছে। প্রসঙ্গত তাই বলতে হয় যে যদিও ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে এই জেলায় মুসলিম লীগের আনুষ্ঠানিক জন্ম হয়েছিল, কিন্তু এর সাংগঠনিক কাজকর্ম দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। তারই ফলশ্রুতি হিসাবে ১৯৩৭ সালের অক্টোবর মাসে বহরমপুর শহরের গোরাবাজার অঞ্চলে কৃষ্ণনাথ কলেজের কুমার হোস্টেলের মাঠে মুসলিম লীগের রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। স্বয়ং মহম্মদ আলী জিন্না ও অন্যান্য প্রাদেশিক মুসলিম লীগ নেতৃত্ব উপস্থিত হয়েছিলেন। মহম্মদ আলী জিন্না তার ভাষণে বলেছিলেন, "মুসলিম লীগের নিজস্ব একটি নীতি ও কর্মসূচী আছে। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হল এই যে, আমরা (মুসলিম লীগ) জোরের সঙ্গে দাবী করি যে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার (Communal Award) কখনই পরিবর্তন করা উচিত নয়, যতক্ষণ না পর্যন্ত তা একটি চুক্তির ভিত্তিতে হবে। আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে দাবী করছি যে আগামী দিনে ভারতবর্ষে যে সংবিধান রচিত হবে, তা যার দ্বারাই রচিত হোক না কেন, সেখানে যেন মুসলমানদের অধিকার ও স্বার্থ যথাযথভাবে সুরক্ষিত হয়।"(১৩) শ্রী জিন্না আরও বলেন যে, "আমরা কেন মুসলমানদের জন্য লড়াই করছি? যদি মুসলমানগণ এই লড়াইয়ে পরাজিত

হয়, তাহলে ভারতবর্ষের বুক থেকে মুসলমানগণ ধ্বংস হয়ে যাবে। আমরা আমাদের ধর্ম, সংস্কৃতি বা ভাষা নিয়ে যত ইচ্ছা কথা বলতে পারি, কিন্তু রাজনৈতিক শক্তি হল এমন একটি শক্তি, যা আমাদের ধর্ম, সংস্কৃতি ও ভাষাকে সুরক্ষিত করবে। এই জন্যই আমরা লড়ছি।"(১৪)

বলাবাহুল্য, এই ধরনের বক্তব্য দ্বারা প্ররোচিত হয়ে জেলার মুসলিম লীগ নেতৃত্ব মাঝেমাঝেই কিছু কিছু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও উত্তেজনা সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, ১৯২৪-১৯২৫ খৃষ্টাব্দে এবং ১৯৪২-৪৩ খৃষ্টাব্দে হিন্দু প্রতিমা বিসর্জনকে কেন্দ্র করে জঙ্গীপুর মহকুমার সুতী ও রঘুনাথগঞ্জ এলাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগানোর প্রচণ্ড চেষ্টা করা হয়। ১৯৪২-৪৩ খৃষ্টাব্দের ঘটনায় জঙ্গীপুর মহকুমা তৎকালীন মহকুমা শাসক (S.D.O) যিনি মুসলিম ধর্মাবলম্বী ছিলেন, স্বয়ং এই সাম্প্রদায়িক ঘটনায় উস্কানি দিয়েছিলেন—যা বঙ্গীয় বিধানসভার দুই মাননীয় সদস্য অতুল কুমার ও নবাবজাদা নাসারুল্লাকে নিয়ে গঠিত তদন্ত কমিশনের রিপোর্টে ধরা পড়ে।(১৫) কিন্তু জেলা শাসক ও স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যস্থতায় তা বেশিদূর এগোতে পারেনি। একইভাবে ১৯৪০-এ এই জেলার কালিয়াগঞ্জে মহরমের শোভাযাত্রাকে কেন্দ্র করে এক সাংঘাতিক সাম্প্রদায়িক ঘটনা চলেছিল যার ফলে পুলিশ গুলি চালাতে বাধ্য হয়। তিনজন মুসলিম নিহত ও এগার জন আহত হন ঐ ঘটনায়।(১৬) আবার ১৯৩০ ও ৪০-এর দশকে খেলডাঙ্গা ও হরিহরপাড়া এলাকায় বকর-ইদ বা কোরবাণীর ঘটনাকে কেন্দ্র করে কিছু কিছু সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার খবর পাওয়া যায় সরকারী ও বেসরকারী রিপোর্টে। কিন্তু কোনটাই বেশিদূর এগোতে পারে নি। বলাবাহুল্য ঐ সকল ঘটনাগুলিতে উভয় সম্প্রদায়ের কিছু মানুষই ইন্ধন জুগিয়েছিলেন। কিন্তু কোন ঘটনা বেশিদূর এগোতে পারে নি। একদিকে যেমন স্বাধীনতার স্লোগান তুলে জাতীয় কংগ্রেস জাতীয়তাবাদকে জাগরিত করে ১৯৩৭ ও ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে ব্যাপকভাবে হিন্দুদের সমর্থন লাভ করেছিল, ঠিক তেমনিই পাকিস্তানের স্লোগান মুখরিত হয়ে মুসলিম লীগ এই জেলা তথা সমগ্র রাজ্যে মুসলিমদের বিরাট অংশকে নিজের দিকে টানতে পেরেছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, মুর্শিদাবাদ জেলায় এ. কে. ফজলুল হকের কৃষক-প্রজা পার্টির কোন অস্তিত্ব ছিল না।(১৭)

পীড়নের যেসকিছু ঘটনাও আমাদের নজরে এসেছে এবং এই জেলার হিন্দু জমিদারদের বেশির ভাগই হিন্দু মহাসভার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। যদিও স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরেই তাদের বেশির ভাগই রাতারাতি পোশাক পরিবর্তন করে কংগ্রেসে যোগদান করেন এবং এদেরই কোন কোন ব্যক্তি ১৯৫২ সালের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসের মনোনয়ন লাভ করেন। মুসলিম লীগের কিছু পাণ্ডা একই পদাঙ্ক অনুসরণ করে কংগ্রেসে যোগদান করেন, বিধানসভায় কংগ্রেসী হিসাবে নির্বাচিত হন—এমনকি ডা: বিধান রায় মন্ত্রী সভার সদস্য পর্যন্ত হন। তার নাম সৈয়দ কাজেম আলী মির্জা।(১৮)

১৯২৯, ১৯৩৭, ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে লীগের পাশাপাশি হিন্দু মহাসভাও নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়েছিল এবং রাজ্যের অন্যান্য জেলার ন্যায় মুর্শিদাবাদ জেলাতেও উগ্র মুসলিম বিরোধিতার স্লোগান তুলে যেসকিছু হিন্দুর ভোট লাভ করেন। উগ্র মুসলিমবিরোধী এই দল উগ্র হিন্দুবিরোধী মুসলিম লীগের সম্পূর্ণ বিপরীতে অবস্থান করে সারা ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পটভূমি রচনা করেছিল যা সাম্রাজ্যবাদ, কায়েমী স্বার্থ ও আমলাতন্ত্রের স্বার্থরক্ষা করেছিল একান্তভাবে। মুর্শিদাবাদ জেলার মূল পৃষ্ঠপোষক মহারাজা মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বা মহারাজকুমার শ্রীশ চন্দ্র নন্দী হলেও-রায়-বাহাদুর কিরীটি ভূষণ দাস, রায়বাহাদুর সুরেন্দ্র নারায়ণ সিংহ, জ্ঞান লাহিড়ী, দ্বিজপদ চ্যাটার্জী, শিশির কুমার বিশ্বাস, সৌরীন্দ্র মোহন রায়, কুমদা চরণ রায়, শরৎ চন্দ্র ত্রিবেদী, বিজয়েন্দ্র নারায়ণ রায়, ধীরেন্দ্রনাথ রায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এদের মধ্যে রায়বাহাদুর কিরীটি ভূষণ দাস যদিও নির্দল প্রার্থী হিসাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ১৯২৯, ১৯৩৭ সালে মুর্শিদাবাদ জেলার অন্যতম বিধায়ক হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন, কিন্তু তার পিছনে ছিল হিন্দু মহাসভার পূর্ণ সমর্থন। ঠিক একই কায়দায় ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে মুর্শিদাবাদ সাধারণ (Murshidabad General Constituency) কেন্দ্র থেকে রায়বাহাদুর সুরেন্দ্র নারায়ণ সিংহ হিন্দুমহাসভা সমর্থিত নির্দল প্রার্থী হিসাবে কংগ্রেস প্রার্থী শশাঙ্ক শেখর সান্যালের নিকট পরাজিত হন। মুর্শিদাবাদ জেলার জোতদার-জমিদার বা মহাজনদের অনেকেই সেই যুগে কংগ্রেসের চেয়ে হিন্দু মহাসভাকেই বেশি পছন্দ করতেন। সম্ভবতঃ রাজশক্তির বিরাগভাজন হওয়ার ভয়ে এবং তারা রায়বাহাদুর সুরেন্দ্র নারায়ণ [illegible] (District

Board), ইউনিয়ন বোর্ড ও মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনে ভোট দিতেন। (১৯) ১৯৫০-১৯৪০ এর দশকে জেলার প্রায় সমস্ত স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন সংস্থার নির্বাচনে মূলত তারাই ক্ষমতা দখল করেছিলেন। এর অর্থ অবশ্য এই নয়, এই যুগে মুর্শিদাবাদ জেলায় কংগ্রেসের সঙ্গে যে সমস্ত জোতদার-জমিদারগণ ছিলেন, তারা সকলে প্রগতিশীল। কারণ শ্রেণীস্বার্থের প্রশ্ন যখনই দেখা দিত, অথবা বঙ্গীয় বিধান পরিষদ বা বিধানসভায় যখনই ভূমিরাজস্ব বিলের উপর কোন সরকারী বা বেসরকারী সংশোধনীর উপর আলোচনা বা ভোটাভুটি হতো, তখন সকলেই তারা শ্রেণীস্বার্থের পক্ষেই ভোট দিতেন নির্বিশেষে। (২০)

কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো এই যে, মুর্শিদাবাদ জেলার সাম্প্রদায়িক রাজনীতির এই প্রেক্ষাপট বা চেহারা থাকা সত্ত্বেও এই জেলায় সেরকম কোন উল্লেখযোগ্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটে নি। এমনকি ১৯৪৬ সালের আগস্ট মাসের সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলিতেও নয়—যখন কলকাতার মাত্র ৪ দিনে ৬০০০ হিন্দু মুসলমান খুন হয়েছিলেন। অথবা যখন ঢাকা, নোয়াখালি, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি জেলাগুলি সাম্প্রদায়িকতার লেলিহান শিখায় দাউদাউ করে জ্বলছিল এবং মহাত্মা গান্ধীকে ছুটে আসতে হয়েছিল কলকাতা ও নোয়াখালিতে। নিঃসন্দেহে এই জেলার মানুষের একটি গর্বের বিষয় এই সাম্প্রদায়িক বা সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী চরিত্র ও মানসিকতা। স্বাধীনতা-পূর্ব যুগের রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসে এটি একটি গৌরবোজ্জল অধ্যায়।

কিন্তু কেন? কিভাবে তা সম্ভব হয়েছিল? শ্রমিক-কৃষকের ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলন গড়ে উঠেছিল কি সেই যুগে মুর্শিদাবাদ জেলায় যা সাম্রাজ্যবাদ, সামন্ততন্ত্র ও তাদের সৃষ্ট সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল? তা তো নয়। কারণ সেরকম প্রগতিশীল শক্তির অস্তিত্ব ছিল এই জেলায় খুবই নগণ্য। কমিউনিস্ট আন্দোলন বা সংগঠন ছিল একেবারে তার প্রাথমিক স্তরে বা শৈশব অবস্থায়। সুতরাং কারণগুলি অনুসন্ধান করতে গেলে কতকগুলি চমকপ্রদ বৈশিষ্ট্য ও সূত্র আমাদের সামনে প্রতীয়মান হয়ে ওঠে।

প্রথমত সুদীর্ঘকাল ধরে এই জেলায় হিন্দু ও মুসলমানদের সহঅবস্থান এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। সুপ্রাচীন কাল থেকে এই জেলা বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব

তার প্রতিফলন আজও লক্ষ্য করার মতো। ফলত জেলার সমস্ত স্তর ও ধর্মের মানুষের উপর এদের নমনীয় ও সুন্দর দিকগুলি ভীষণভাবে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সহঅবস্থান ও সম্প্রীতির পরিবেশ গড়ে তুলেছে। নানান ঘাতপ্রতিঘাত সত্ত্বেও আজও দোল উৎসব, মহরম, বেরা উৎসব, শিবরাত্রি উৎসব বা গাজনের উৎসবে উভয় সম্প্রদায়ের মানুষকেই একত্রে দেখা যায়। মুর্শিদাবাদ জেলার সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী মানসিকতা গঠনে এসবের গুরুত্ব অপরিসীম।(২১) সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিষবাষ্প আঘ্রাণ চেষ্টা করা সত্ত্বেও তার অনেকটাই ভাসতে পারে নি। ফলে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড কার্জন যখন হিন্দু মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ জাতীয় জাগরণকে বিনষ্ট করার জন্য কুখ্যাত বঙ্গ-ভঙ্গের প্রস্তাব দিলেন, তখন রাজ্যের বিভিন্ন এলাকার সঙ্গে ঐ বছর ৬ই আগস্ট বহরমপুর শহরে জনৈক ইউসুফ জিলানীর নেতৃত্বে ঐ সাম্রাজ্যবাদী অপকৌশলের বিরুদ্ধে এক উত্তেজনাপূর্ণ ছাত্র আন্দোলন গড়ে উঠেছিল।(২২) অপরদিকে ১৯২২ খ্রষ্টাব্দে হিন্দু ও মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ মিছিল যা খিলাফৎ আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলনকে মূলভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে চালিত করেছিল, এবং আওয়াজ তুলেছিল "খোদাকা পেয়ার মহম্মদ আলী—সাক্ষাৎ বরম্ মহাত্মা গান্ধী"—বহরমপুর তথা মুর্শিদাবাদ জেলার রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসে তা এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায় হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে।(২৩)

বিতীয়ত সমসাময়িককালের কিছু বিশিষ্ট মুসলিম জননেতার নাম সবিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে এই প্রসঙ্গে। তাদের অসাধারণ ভূমিকা সেই যুগে মুর্শিদাবাদ জেলার সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে ভীষণভাবে আঘাত হেনেছিল। সেই সকল জাতীয়তাবাদী মুসলিম জননেতারা হলেন মৌলভী আবদুল সামাদ, মাকসুদাল হোসেন ওরফে জুমাই মিঞা, আবদুল আহমেদ ইউসুফ জিলানী, রেজাউল করিম প্রমুখ। এঁরা অকাতভাবে জেলার পথে-প্রান্তরে, খবরের কাগজের পাতায়, সভাসমিতিতে, বিধান পরিষদের কক্ষে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর জীবনদর্শনে একান্ত বিশ্বাসী এই মানুষগুলি তাঁদের বক্তৃতা অথবা লেখনীকে অস্ত্র হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন এবং মুসলিম সাম্প্রদায়িক শক্তির মোকাবেলা

সাইমন কমিশন যে যে পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থার (Separate electorate) প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন, মৌলভী আবদুস সামাদ বঙ্গীয় বিধান পরিষদের অধিবেশনে (১৯৩০) স্বার্থহীন ভাষায় তার প্রতিবাদ করলেন এবং দীর্ঘ ৪ বছর ধরে জনমত গঠন করতে চেষ্টা করলেন। শ্রীসামাদ ছিলেন জেলার বিশিষ্ট আইনজীবী, মুর্শিদাবাদ জেলা বোর্ডের সহঃ সভাপতি, জেলার নির্বাচিত বিধায়ক ও বিশিষ্ট কংগ্রেসনেতা। মৌলভী আবদুস সামাদ পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিধান পরিষদে বললেন "এইরূপ নির্বাচনী ব্যবস্থায় একজন মুসলিম ভোটপ্রার্থীকে নির্বাচকদের সামনে বলতে হবে যে প্রথমত তিনি একজন মুসলমান এবং তারপর ভারতীয়। তিনি যত বেশি সাম্প্রদায়িক বা জাতীয়তাবিরোধী ভূমিকা পালন করতে পারবেন, তার সাফল্যের সম্ভাবনা তত বেশি উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। সেই রকম একজন হিন্দু ভোটপ্রার্থীকেও তার নির্বাচকদের কাছে একই ভূমিকা পালন করতে হবে। এর ফল যা হবার তাই হবে। এই নতুন আইন যতদিন বলবৎ হয়েছে, সেইদিন থেকেই হিন্দু ও মুসলমানদের সম্পর্ক ক্রমে ক্রমে তিক্ত হতে শুরু করেছে এবং ভয়ঙ্কর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।"(২৫) তাঁর মতে, "সাইমন কমিশন সৃষ্ট এই বিভেদ নীতি সাম্প্রতিককালের হিন্দু মুসলমান সংঘাতের অন্যতম মূল কারণ। জাতীয় স্বার্থবিরোধী এই নীতি চিরতরের জন্য ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিকাশকে রোধ করবে।"(২৬)

আবদুস সামাদ মনে করতেন যে, "এই দেশের হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের স্বার্থ ও উন্নতি পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। একে অপরের সাহায্য ও সহযোগিতা ছাড়া চলতে পারে না।"(২৭) শ্রীসামাদ আরও বলেন যে, "Divide & rule"-এর নীতি সকল সাম্রাজ্যবাদী দেশই অনুসরণ করে থাকেন এবং ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ একটি দায়িত্বশীল সরকারের মুখোশ পরে সেই একই নীতি অনুসরণ করে চলেছেন। মুর্শিদাবাদ জেলা District Board-এর সহঃ সভাপতি হিসাবে তিনি তার দীর্ঘ ১০ বছরের অভিজ্ঞতায় দেখেছিলেন যে হিন্দু সভাপতি ও সদস্যবৃন্দের বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতায় জেলার মুসলিম জনসাধারণ যে সুযোগ বা উপকার লাভ করেছিল, তা অতীতে কোনদিন ঘটে নি।"(২৮) শ্রীসামাদ তার দীর্ঘ ২৫ বছরের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতায় এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে মেলামেশার অভিজ্ঞতায় দেখেছিলেন যে "হিন্দু সম্প্রদায় মুসলিমদের সঙ্গে সহযোগিতা

করে দেশের ঐক্য সুরক্ষিত করতে প্রস্তুত। উদার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তারা সমস্ত সাম্প্রদায়িক সমস্যা, এমনকি চাকরীর ও অন্যান্য সমস্যাও মিটিয়ে নিতে চান। কিন্তু মুসলিম নেতৃবৃন্দ বারবার হিন্দু সম্প্রদায়ের বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে বিচ্ছেদ ও অবিশ্বাসের রাজনীতি অনুসরণ করে চলেছেন—যা আত্মহত্যার সামিল। তারা কেবল হিন্দুদের দোষত্রুটিগুলিই বড়করে দেখেন। কিন্তু হিন্দুদের নিকট তাদের ঋণ স্বীকার করতে ভুলে যান। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী জাতিধর্মনির্বিশেষে সমস্ত স্তরের ছাত্র-ছাত্রীর জন্য যে ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছেন তা তারা স্বীকার করতে ভুলে যান। তারা ভুলে যান যে দেশের শতকরা ৯৯ ভাগ বেসরকারী স্কুল এবং কলেজ হিন্দুদেরই তৈরী এবং তা সত্ত্বেও সেখানে মুসলিম ছাত্রদের জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা আছে।...এর পরেও Separate electorate এর নীতি মেনে নিয়ে মুসলিমরা অধিক কি সুবিধা পাবেন?"(২৯) সুতরাং আবদুস সামাদ সাহেব মনে করেন যে "দুর্ভাগ্যক্রমে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন একটি গোষ্ঠী আছে, যদিও সেই গোষ্ঠী খুব ছোট, কিন্তু ভীষণ প্রভাবশালী—যারা নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থে, দেশের স্বার্থ, এমনকি নিজ সম্প্রদায়ের স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে প্রস্তুত", এবং সেই উদ্দেশ্যেই পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থাকে তারা সমর্থন করছেন।(৩০)

মৌলভি আবদুস সামাদ মনে করতেন যে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা, পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থা অথবা যে কোন ধরনের সাম্প্রদায়িকতা কোন সম্প্রদায়ের স্বার্থকেই সুরক্ষিত করতে পারে না। কারণ সাম্প্রদায়িকতা আমলাতন্ত্র কায়েমী স্বার্থ ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সৃষ্টি। কাজেই ঐ সকল শ্রেণীর স্বার্থকেই তা সুরক্ষিত করে। সে কারণেই সাধারণ হিন্দু-মুসলমানদের স্বার্থেই তিনি সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হন।(৩১) তাঁর মতে, "সামাজিক সংস্কার এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ও মুসলিম নারী সম্প্রদায়ের মুক্তি একান্ত প্রয়োজনীয়, এবং এইগুলিই লক্ষ লক্ষ গরীব মুসলমানদের অবস্থার উন্নতি করতে পারে বা স্বার্থ সিদ্ধ করতে পারে।"(৩২)

১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী যেদিন বঙ্গীয় বিধান পরিষদে [illegible]কার রায় বাহাদুর সতেন্দ্র কুমার দাস বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হচ্ছিল, তা দমন করার কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আলোচনা

উত্থাপন করেন এবং একটি বিল আনয়ন করেন. মৌলভী আবদুস সামাদ দীর্ঘ বিশ্লেষণী ভাষণে পুনরায় বলেন যে পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থা বাতিল না করলে কখনই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বন্ধ হতে পারে না। কারণ এইরূপ নির্বাচনী ব্যবস্থায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় কোন অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক প্রশ্নকে সামনে রেখে নয় ধর্মীয় প্রশ্নকে ভিত্তি করে। কাজেই নির্বাচন প্রার্থীরা কট্টর ধর্মীয় মৌলবাদীদের মদত দেন নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার জন্য। এটা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ব্যাপার এবং যদি একে প্রশ্রয় দেওয়া হয় তাহলে তার ফল হবে ভারতবর্ষের পক্ষে অত্যন্ত বিষময় এবং ভবিষ্যতের স্বাধীন ভারতবর্ষের নির্বাচনী ব্যবস্থায় এই সাম্প্রদায়িক ভোট ব্যবস্থাই চিরস্থায়ী হয়ে যাবে।"(৩৩) নিঃসন্দেহে আজ থেকে ৩৪ বছর আগে আবদুস সামাদ সাহেব যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন জনসভায় অথবা বিধান পরিষদের কক্ষে আজ স্বাধীন ভারতবর্ষের নির্বাচনী চালচিত্রে অক্ষরে অক্ষরে তা মিলে যাচ্ছে। কায়েমী স্বার্থ বা প্রতিক্রিয়ার শক্তি সেদিনও যা করেছিল আজও তাই করে চলেছে। ভারতবর্ষের কোটি কোটি কৃষক-শ্রমিক ও মধ্যবিত্তের সংগ্রামী ঐক্যকে আজও সেই অশুভশক্তি ধ্বংস করতে উদ্যত একই কায়দায়। কাজেই আবদুস সামাদ সাহেব তৎকালীন বাংলার প্রধানমন্ত্রী সোহরাবর্দী সাহেবকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেছিলেন যে, বাংলার মুসলিম জনসাধারণ পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান করবে যদি গণভোট গ্রহণ করা হয়। কিন্তু সোহরাবর্দী সাহেব সেদিন সামাদ সাহেবের প্রস্তাব মতো গণভোট গ্রহণের সাহস দেখাতে পারেন নি।(৩৪)

অপরদিকে মৌলভী আবদুস সামাদের মানসপুত্র রেজাউল করীম, যিনি হিন্দু ও মুসলিম ঐক্যের প্রতীক হিসাবে আজও মুর্শিদাবাদ জেলায় বেঁচে আছেন এবং সংগ্রামে অবিচল, তার ভূমিকাও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে তিনি অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং এই জেলার সালার জাতীয় স্কুলে যোগদান করেন একজন শিক্ষক হিসাবে। তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী মাকসুদাল হোসেন ওরফে জুমাই মিঞা পরবর্তীকালে ব্রজভূষণ গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত "কর্মকুটীরে" যোগদান করেন। (৩১) একনিষ্ঠ গান্ধীবাদী রেজাউল করীম একই সঙ্গে লড়াই চালিয়েছেন ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে বিকশিত করে দেশকে স্বাধীন করার জন্য এবং বিষাক্ত সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে। তিনি চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন বহরমপুর থেকে প্রকাশিত

মুসলিম লীগের মুখপত্র "ইসলাম জ্যোতি" পত্রিকাকে। (৩৬) রেজাউল করীম সাহেব মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন যে, পৃথকীকরণের নীতি মুসলিম সমাজের কোন উপকার করতে পারে না। কারণ পৃথিবীর ইতিহাস একথাই বলে যে এই নীতি একটি জাতিকে উন্নত করার পরিবর্তে সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে চূড়ান্তভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। তাঁর মতে, ভারতের স্বার্থ বা কল্যাণের প্রশ্ন যেখানে জড়িত, সেখানে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি একজন ভারতীয় ছাড়া আর কিছুই নন। মুসলমান বা হিন্দু নয়, ভারতের স্বাধীনতা বা সামগ্রিক স্বার্থই তাঁর স্বপ্ন।(৩৭) তিনি দৃঢ়তার সঙ্গেই মনে করেন যে "হুব্বুল ওয়াতন—মিনাল ইমান"—অর্থাৎ ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ পরস্পর ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। দুয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নেই।(৩৮) জেলার পথেপ্রান্তে করীম সাহেবের অসংখ্য বক্তৃতা অথবা তাঁরই সম্পাদিত "দুরবীন" বা "সৌরভ" নামক পত্রিকার প্রচার মুর্শিদাবাদ জেলায় স্বাধীনতা-পূর্ব যুগে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে নিঃসন্দেহে যথেষ্ট সহায়তা করেছিল।

প্রসঙ্গক্রমে মুর্শিদাবাদ জেলার নবাব বাহাদুর ওয়াসিফ আলী মির্জার নামও নিশ্চয় উল্লেখ করতে হবে। এই জেলার "সিয়া" সম্প্রদায়ের নেতা নবাব বাহাদুর ওয়াসিফ আলী ছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এক উদার-নৈতিক ব্যক্তিত্ব। তিনি সমগ্র জীবনব্যাপী এই জেলা তথা রাজ্যে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি রক্ষার জন্য সংগ্রাম করেছিলেন। তিনি আদর্শগত লড়াই চালিয়েছিলেন সাম্প্রদায়িক ধাঁটোয়ারা বা বেলফাস্টের বিরুদ্ধে। তাঁর সৃষ্ট "হিন্দু-মুসলমান ঐক্য সমিতি" এবং ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদ জেলার হাজারদুয়ারীর সম্মুখস্থ বিশাল প্রাঙ্গনে আহূত হিন্দু-মুসলিম ঐক্য সম্মেলন একটি ঐতিহাসিক ঘটনা হিসাবে আজও ভাস্বর। দুদিনব্যাপী ঐ সম্মেলনে সৌমেন ঠাকুর, তুলসী গোস্বামী, হুমায়ুন কবীর প্রভৃতি জননেতা বক্তব্য রাখেন এবং সভাপতিত্ব করেন নবাব বাহাদুর স্বয়ং। এইপ্রকাণ্ড সম্মেলনে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত প্রায় ১০ হাজার সাধারণ হিন্দু-মুসলমান উপস্থিত ছিলেন।(৩৯) তৎকালীন বাংলার প্রধানমন্ত্রী জনাব এ. কে. ফজলুল হক নবাব বাহাদুরের এই প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানান সার্বিকভাবে। কারণ তিনি মনে করতেন যে মুসলমান ও অমুসলমান একতার মধ্য দিয়েই ভারতের রাজনৈতিক অগ্রগতি সম্ভব। সেকারনেই তিনি Progressive

Muslim League গঠন করেন। মুর্শিদাবাদ জেলারই সৈয়দ বদরুদ্দোজা এই সংগঠনের সম্পাদক নিযুক্ত হন। মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুরের ন্যায় ফজলুল হকও মনে করতেন যে জিন্নাকে জবাব দেবার একমাত্র উপায় হল হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ঐক্যের মনোভাবকে সম্প্রসারিত করা, দ্বি জাতি তত্ত্বের বিরুদ্ধে একটি ভারতীয় জাতীয়বোধ বিকশিত করা।(৪০) কাজে কাজেই এইরূপ চিন্তা-ভাবনা জেলার রাজনৈতিক তথা সাংস্কৃতিক জগতে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল—একথা বলাবাহুল্য। অপরদিকে তৎকালীন বাংলাদেশের রাজনৈতিক-সামাজিক পরিবেশ অনুকূলে না থাকায় নবাব বাহাদুর প্রতিষ্ঠিত Hindu-Muslim Unity Associationকে অনেক বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়। ১২৪১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ফজলুল হক কর্তৃক দ্বিতীয়বার মন্ত্রিসভা গঠিত হবার পর বাংলাদেশে অনেকেই এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভব করেন। যদিও মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ এর বিরুদ্ধে বিষোদ্গার শুরু করেন এবং যে সকল মুসলিম নেতৃবৃন্দ এই সম্মেলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাদের তীব্র সমালোচনা করতে শুরু করেন।(৪১)

প্রসঙ্গত ১১ ২ সালের ২০শে জুন কলকাতায় হিন্দু-মুসলিম ঐক্য সম্মেলনে মুর্শিদাবাদ জেলার নবাব বাহাদুর তাঁর সভাপতির ভাষণে সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে একতাবদ্ধ হয়ে এক নবজীবনের ভিত্তি স্থাপনে উদ্যোগী হতে বলেন। তিনি হিন্দু ও মুসলমানদের পৃথক অস্তিত্বে বিশেষ কোন গুরুত্ব আরোপ করতে রাজী নন। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন যে, এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের সাহায্য ছাড়া কিছুতেই অগ্রসর হতে পারে না। শুধু নিজের ধর্মের কথা ভাবলেই চলবে না, গোটা জাতির কল্যাণের জন্যও তাদের দায়িত্ব পালন করতে হবে। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, হিন্দু-মুসলমান ঐক্যে বিশ্বাসী ব্যক্তিরা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের আদর্শ বিকাশে কর্মরত হবার প্রয়োজনীয়তার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করবেন। নবাব বাহাদুর মনে করতেন যে, দীর্ঘকাল ধরে এই দুই সম্প্রদায় সহোদরার মতো পাশাপাশি বাস করছে। তাই আজ ভারতের রাজনীতির এক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে বিভেদের যে প্রাচীর পরস্পরকে খানিকটা আলাদা করেছে তা ভেঙ্গে ফেলে মিলনের সেতু রচনা করতে হবে। একতাই ধ্রুবতারার মতো তাদের পথ আলোকিত করে পরস্পরের হাত ধরে সামনের দিকে এগুতে

সাহায্য করবে এবং বিভিন্ন স্তরের মধ্যদিয়ে জীবনকে আনন্দময় করে তুলবে।(৪২)

অপরদিকে বেশকিছু প্রভাবশালী হিন্দু জননেতা যাঁরা জেলায় সাম্প্রদায়িক ঐক্যের স্বার্থে আপ্রাণ সংগ্রাম করেছেন তাদের নামও নিঃসন্দেহে উল্লেখের দাবী রাখে। তাঁদের মধ্যে ব্রজভূষণ গুপ্ত, শ্যামাপদ ভট্টাচার্য্য, দুর্গাশঙ্কর শুকুল, তারাপদ গুপ্ত, বিজয় কুমার ঘোষাল, শশাঙ্ক শেখর সান্যাল প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। এদের প্রায় সকলের সঙ্গেই কাজী নজরুলের ভীষণ ঘনিষ্ঠতা ছিল। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে বহরমপুর জেল থেকে মুক্তিলাভ করার পর কাজী নজরুল প্রায়ই বহরমপুর আসতেন এবং এদের বাড়ীতেই উঠতেন। তার গান, কবিতা এবং কংগ্রেসী জনসভায় বক্তৃতা জাতিধর্মনির্বিশেষে জেলার সকল মানুষকেই প্রভাবিত করেছিল। স্বাধীনতা-পূর্ব যুগে মুর্শিদাবাদ জেলায় উভয় ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি রক্ষায় তা যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। কথিত আছে যে নজরুলের বিখ্যাত "জাতের নামে বজ্জাতি সব" গানটি বহরমপুর ভট্টাচার্য্যপাড়ার (যেখানে প্রায়শই নজরুল থাকতেন) কালীপুজো উপলক্ষে একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করেই সেই রাত্রে নজরুল বহরমপুরেই রচনা করেন।(৪৩) প্রসঙ্গক্রমে ১৯২৪ ২৫ খৃষ্টাব্দে হিন্দু প্রতিমার বিসর্জনের প্রশ্নে জঙ্গীপুর মহকুমায় যে সাম্প্রদায়িক বিরোধ দেখা দেয়, তার মীমাংসা করে উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ একবাক্যে ব্রজভূষণ গুপ্তকেই সালিশ নির্বাচিত করেন। অর্থাৎ আম্পায়ার হিসাবে তিনি যা মীমাংসা করে দেবেন, তা সকলেই মেনে নেবেন।(৪৪) জীবন্তের প্রতি দেশবাসীর এই শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস জেলার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ইতিহাসে দৃষ্টান্তস্বরূপ। এই জেলার বেলডাঙ্গা, নওদা প্রভৃতি অঞ্চলে গরীব হিন্দু ও মুসলমান কৃষক সম্প্রদায়ের কাছে তিনি একসময় হয়ে উঠেছিলেন কিংবদন্তী। তারা সেদিন (এই শতাব্দীর প্রথম দশকে) ব্রজভূষণ গুপ্তকে কেন্দ্র করে গান পর্যন্ত রচনা করেছিলেন। কারণ গরীব কৃষকসম্প্রদায়কে জমির উপর তাদের অধিকার খর্ব করার জন্য কাশিমবাজারের মহারাজা যে ষড়যন্ত্র করেছিলেন, তার বিরুদ্ধে ব্রজভূষণ বাবুই রুখে দাঁড়ান এবং কাশিমবাজার মহারাজার জাঁদরেল ব্যারিষ্টারদের পরাস্ত করে এই তরুণ আইনজীবী ব্রজভূষণ গুপ্তের সাফল্য এক ঐতিহাসিক ঘটনা।(৪৫) জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষ সেকারণে তাকে নিজের আপন মানুষ হিসাবে গ্রহণ

করেছিলেন। কাজেই এই সমস্ত বিরাট মাপের মানুষদের প্রভাব ভীষণভাবে জেলার সমাজ ও রাজনৈতিক জীবনে প্রভাব বিস্তার করেছিল।

এরই পাশাপাশি এই জেলার "বাউল" সম্প্রদায়, যারা জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে আছেন, যারা কোন ধর্ম মানেন না, কোন জাতিভেদ মানে না, শরিয়ৎ বা কোন ধর্মগ্রন্থে বিশ্বাস করেন না—জাতিধর্মনির্বিশেষে সকল মানুষকে ভালোবাসা প্রকৃত ধর্ম বলে মনে করেন—সেই সম্প্রদায়ের বক্তব্য, গান ও কার্যকলাপ ব্যাপকভাবে না হলেও জেলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জগতে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল। মৌলবাদী মুসলিমরা এদের শত্রু বলে মনে করেন এবং এদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালান—যা আজও চলছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই "বাউল" সম্প্রদায়ের কাজকর্ম সাধারণত: প্রকাশ্যে দেখা যায় না। মুর্শিদাবাদ জেলায় স্বাধীনতা-পূর্ব যুগে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী মানসিকতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এদের অবদান অনস্বীকার্য।(৪৬)

বাউলদের পাশাপাশি মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য পীরসাহেব বা ফকিরদের আস্তানা বা "মাজার" জেলার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অক্ষুণ্ণ রাখার ক্ষেত্রে এক প্রশংসনীয় অবদান রাখে। কারা ফকির এনিয়ে অনেক বিতর্ক আছে। তবে আধুনিক অনেক গবেষকই তথ্য সহকারে দেখিয়েছেন যে ঐতিহাসিক ফকির বিদ্রোহের পরাজিত বহু নায়ক বা সৈনিক প্রাণভয়ে মুর্শিদাবাদ ও তার আশেপাশের কিছু জেলায় আত্মগোপন করে এই সমস্ত আস্তানাগুলি গড়ে তোলেন এবং সমাজজীবনে নানা কাজকর্ম করে সর্বস্তরের মানুষকেই আপন করতে পেরেছিলেন। জাতিধর্ম-নির্বিশেষে হাজার হাজার নরনারী এদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং বংশানুক্রমে তা চলে আসছে। আজও জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ঐ সমস্ত ফকিরদের "মজার" বা কবরকে কেন্দ্র করে বৎসরের বিভিন্ন নির্দিষ্ট দিনে চলে উৎসব ও মেলা। হাজার হাজার হিন্দু-মুসলিম নরনারী সেই মেলায় সমবেত হন, মানত করেন পশুবলি দেন, সিন্নি চড়ান, একত্রে খাওয়া-দাওয়া ও নৃত্য-গীত করেন। আতাই-শেরপুর বা হামিদহাটি পিলখুণ্ডি গ্রামে অবস্থিত পীরসাহেবের মাজার বা মেলা আজও এর সাক্ষ্য বহন করছে। এরকম আরও অনেক ছোটবড় মেলা বসে এই জেলায়। আজও লালবাগ শহরে বা তার আশেপাশের বিভিন্ন এলাকায় প্রায় পাশাপাশি হিন্দু মন্দির

ও মুসলমান মসজিদের সহঅবস্থান চোখে পড়ার মতো। এগুলি সবই স্বাধীনতা-পূর্ব যুগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।(৪৭)

মুর্শিদাবাদ জেলার সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী মানসিকতা গঠনে এসবের গুরুত্ব অপরিসীম। সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিষবাষ্প আক্রান্ত চেষ্টা করেও তার অনেকটাই ভাঙতে পারে নি। সাম্প্রতিক ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এই ঘটনা বা ইতিহাস আরও গভীর বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে।

নির্দেশিকা

১ Census 1951 ; West Bengal District Handbooks. Murshidabad, edited by A. Mitra. Vide Chapter on Introduction.

২ Bengal District Gazetteers—Murshidabad, 1914. edited by L. S. S. O'Malley.

৩ Census 1951, op. cit. এবং সৌমেন গুপ্ত—শিক্ষায় মুর্শিদাবাদ : পটভূমি ও সমস্যা (জিয়াগঞ্জ শহরে অনুষ্ঠিত প: ব: কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির ৪৬তম রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষে ১৯৮২ খৃঃ প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থ)

৪ Gupta Bishan Kumar ; Political Movements in Murshidabad 1920-47 (An unpublished thesis submitted for Ph. D degree.

৫ মুর্শিদাবাদ জেলার প্রবীণ কমিউনিষ্ট নেতা শ্রীসনৎ রাহার সাক্ষাৎকার এবং Sen Sunil ; Peasant Movement in India. Calcutta, 1982.

৬ Gupta Bishan Kumar ; op. cit.

৭ কৃষ্ণনাথ কলেজ শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ, বহরমপুর, ১৯৭৪

৮ Gupta Bishan Kumar ; op. cit.

৯ Sen Shila : Muslim Politics in Bengal (1937-47), New Delhi, 1976.

১০ Gupta Bishan Kumar ; op-cit এবং সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশন প্রদত্ত তথ্যাবলী

১১ Gupta Bishan Kumar ; op-cit এবং Chattapadhyay Goutam ; Bengal electrol Politics and Freedom Struggle (1862-1947), New Delhi. 1984.

১২ শশাঙ্ক শেখর সান্যালের সাথে একটি সাক্ষাৎকার এবং Sen Shila . op-cit.

১৩ Hindusthan Standard, Calcutta, 26. 10. 37এবং গুপ্ত প্রফুল্ল ; স্বাধীনতা সংগ্রামে মুর্শিদাবাদ, কলিকাতা, ১৯৭৪, পৃঃ ৭৪

১৪ Hindusthan Standard, Calcutta, 26. 10. 37

১৫ ব্রজভূষণ গুপ্তের জীবনকথা : বহরমপুর, ১৯৫৭, পৃঃ ১৮ এবং Bengal Legislative Assembly Proceedings ; Vol. LXVII, 1944, p. 172.

১৬ Brief Summary of Political events in Bengal During the year 1940, Home Political Department, Govt. of Bengal, pp. 8-9 ; West Bengal State Archives, Calcutta.

১৭ "প্রচার পত্র"—এস. এফ. এইচ মণ্ডলা বঙ্গ নদবী ও মহম্মদ তাবারক উল্লাহ কর্তৃক প্রচারিত, জাবতা, ১লা কার্ত্তিক ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ এবং শশাঙ্ক শেখর সান্যালের সাথে সাক্ষাৎকার

১৮ Gupta Bishan Kumar ; op-cit এবং শ্রীবিজয়কুমার গুপ্ত ও অন্যান্য রাজার সাথে সাক্ষাৎকার

১৯ ঐ, এবং শশাঙ্কশেখর সান্যালের সাথে সাক্ষাৎকার

২০ ঐ, এবং Chattopadhyay Gautam , op-cit.

২১ Gupta Bishan Kumar ; op-cit এবং মুর্শিদাবাদ বীক্ষণ ; বহরমপুর, ১০. ৩. ৮৫

২২ Roy Shantimoy ; Freedom Movement and the Indian Muslims, New Delhi. p. 32.

২৩ গুপ্ত প্রফুল্ল ; স্বাধীনতা সংগ্রামে মুর্শিদাবাদ, কলিকাতা, ১৯৭৫

২৪ মুর্শিদাবাদ বীক্ষণ ; বহরমপুর, অক্টোবর ১৫, ১৯৮৩ এবং রেজাউল করীমের সাথে সাক্ষাৎকার।

২৫ Proceedings of the Bengal Legislative Council—Vol. XXXV, pp. 432-34, 18. 8. 30.

২৬ ঐ

২৭ Proceedings of the Bengal Legislative Council—Vol. XXXVI, p.p. 592-95. 27.3.31.

২৮ ঐ

২৯ Proceedings of the Bengal Legislative Council. Vol.—ঐ

৩০ ঐ

৩১ ঐ

৩২ ঐ

৩৩ Proceedings of the Bengal Legislatve Council. Vol. XXXVIII. pp. 156-58. 4. 2. 32.

৩৪ Proceedings of the Bengal Legislative Council—Vol. XXXVI p.p. 594-95. 27.3.31.

৩৫ শ্রীরেজাউল করীমের সাথে সাক্ষাৎকার

৩৬ ঐ

৩৭ Karim Rezaul ; For India & Islam, Calcutta. 1937. Preface.

৩৮ শ্রীরেজাউল করীমের সাথে সাক্ষাৎকার

৩৯ গুপ্ত প্রফুল্লকুমার : স্বাধীনতা সংগ্রামে মুর্শিদাবাদ, কলিকাতা, ১৯৭৫ এবং মুর্শিদাবাদ বীক্ষণ, বহরমপুর, ১৫. ১০. ৮৬

৪০ দে অমলেন্দু ; পাকিস্থান প্রস্তাব ও ফজলুল হক, কলিকাতা, ১৯৭২, পৃঃ ১৩২

৪১ ঐ; পৃঃ ১৩৬-৩৭

৪২ দে অমলেন্দু—ঐ, পৃঃ ১৩৮-৩৯ এবং Hindusthan Standard, Calcutta, 21. 6. 42.

৩৩ বহরমপুরে বজরুল (প্রবন্ধ), শারদীয়া জনমত, বহরমপুর, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ এবং মুর্শিদাবাদ জেলায় নজরুল চরিতের উপাদান (প্রবন্ধ) স্মরণিকা, বহরমপুর, ১৩৮১
৩৪ ব্রজভূষণ গুপ্তের জীবনকথা : বহরমপুর, ১৩৫৭, পৃঃ ১৮–১৯
৩৫ "আমার ওকালতি জীবনের ষাট বছর"—আত্মকথা—অম্বিকাচরণ রায়, বহরমপুর, ১৩৬৪ এবং সত্যানন্দ গুপ্তের সাথে সাক্ষাৎকার
৩৬ বা শক্তিনাথ মুর্শিদাবাদ জেলায় লোকসমাজের জাতিভেদ ও সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী মানসিকতা (প্রবন্ধ) পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা, কলিকাতা, ২১. ১১. ৮০
৩৭ আহমেদ খাজিম ; পীর ফকিরের আস্তানায়—হিন্দু-মুসলিম মিলনভূমি (প্রবন্ধ) : গণকণ্ঠ—বিশেষ সংখ্যা, বহরমপুর, ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ।

সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পার্টির ২৭তম কংগ্রেসের আলোকে

পারমাণবিক যুগে মতাদর্শগত সংগ্রামের নতুন ধারা

রণধীর দাশগুপ্ত

শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি সংগ্রামের সাফল্যগুলিকে সমাজবিজ্ঞানের অগ্রগতি ও বিপ্লবী তত্ত্বের বিকাশ থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। লেনিন বলেছেন, এটি কারোর মস্তিষ্কপ্রসূত নয়। বিশ্বের সকল দেশের বৈপ্লবিক অভিজ্ঞতা ও বৈপ্লবিক ভাবধারার থেকে এর উদ্ভব। (লেনিন সংকলন, ২১ খণ্ড)

শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী তত্ত্বের প্রবক্তা মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিন তাঁদের বিশাল কর্মকাণ্ড দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে তাঁদের উদ্ভাবিত বিজ্ঞানের ক্ষেত্র বিরাট, সীমাহীন, গতিশীল ও সৃষ্টিশীল। এটা পরিষ্কার যে এই বিজ্ঞানের দ্বারা কেবল সমাজের গতিবিধিই অনুধাবন করা হয় না, সমাজকে পরিবর্তনও করা যায়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির সিদ্ধান্ত যে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সৃষ্টিশীলতাকে আরও সমৃদ্ধ করে তোলার মুখ্য দায়িত্ব পালন করতে হবে পার্টিকে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২৭তম কংগ্রেস ও তার সিদ্ধান্ত রূপায়নের কর্মকাণ্ড সারা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এই কংগ্রেসে যুগের মূল সমস্যাগুলি ও তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিচার করা হয়েছে, এই কঠিন ও বিতর্কমূলক ঐতিহাসিক স্তরে প্রশ্নগুলির সমাধানের ভিত্তি হল তত্ত্ব। দ্বিতীয়ত, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের তত্ত্বের আলোকে সমাজতন্ত্রের বিকাশের মুখে নতুন পরিস্থিতিতে নতুন সমস্যাগুলিকে পার্টির সৃজনশীল যৌথ চিন্তাধারার মধ্যে বিচার করা হয়েছে। বিশ্বের সমকালীন বিরোধসমূহের কারণ এবং তার সমাধানের পথনির্ণয় নির্ভর করছে সাহসের সঙ্গে ও নিরবচ্ছিন্নভাবে তত্ত্বের বিকাশের ওপর। এটা হল কর্মক্ষেত্রে লেনিনবাদের প্রয়োগ।

পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রের উত্তরণের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় যে নতুন

পরিবর্তন ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিপ্লব। এর দুটি দিক আছে—একটা হল মানব কল্যাণের অভূতপূর্ব অগ্রগতির দিক। অপরটা হল পারমাণবিক ও নক্ষত্রযুদ্ধে বিশ্ব-সভ্যতা একেবারে ধ্বংস করার দিক। এই সর্বগ্রাসী ধ্বংসের জন্য বিজ্ঞানের প্রযুক্তিগত বিপ্লব দায়ী নয়। দায়ী হল বিজ্ঞানকে অপব্যবহারকারী সাম্রাজ্যবাদ। আর মানব কল্যাণের জন্য প্রয়োজন হল বিজ্ঞান এবং শ্রমশক্তির সচেতন মৈত্রী যা সম্ভব একমাত্র সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায়।

ইতিহাসে মানব সভ্যতা এমন কঠিন ও বিপজ্জনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় নি। এখানেই হল প্রাক পারমাণবিক চিন্তাধারা এবং বর্তমান চিন্তাধারার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য।

এর ফলে সামাজিক উৎপাদনী শক্তির সঙ্গে মানুষের বিচ্ছিন্নতা বিপজ্জনকভাবে বেড়েছে। পুঁজিবাদের ইতিহাসে এই বিচ্ছিন্নতা রয়েছে কিন্তু তা কখনও এরকম বিশ্বসভ্যতা বিলুপ্তির বিপদ সৃষ্টি করে নি। আবার এই উৎপাদনী শক্তির বিশ্ব বিধ্বংসী গুণগত পরিবর্তন সারা পৃথিবীতে শান্তির জন্য বৈষয়িক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশও সৃষ্টি করেছে, পারমাণবিক যুদ্ধের গুরুতর বিপদ সত্ত্বেও তাকে রোধ করা সম্ভব। অর্থাৎ গণসংহারাস্ত্রগুলির বিকাশের কারণে মানবজাতি এমন একটা স্থানে পৌঁছেছে যখন যুদ্ধ আর রাজনৈতিক লক্ষ্য সাধনের উপায় নয়। কিন্তু বিপদ হল সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি বিপরীতটাই মনে করে। এর ফলে পারমাণবিক যুদ্ধের বিপদ আরও বেড়েছে।

বর্তমান যুগে সমাজপ্রগতির মূল শক্তি হল বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা। এই কারণে পার্টি কংগ্রেসে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে নিখুঁতভাবে বিশ্লেষণ এবং সামগ্রিক স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা ও কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। তত্ত্বে ও রাজনীতিতে, সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের ঐক্যকে প্রথম স্থান দেওয়া হয়েছে। তত্ত্বের ওপরও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে কারণ সমাজতন্ত্রের অগ্রগতি স্বতস্ফূর্ত নয়। দ্রুত উৎপাদন, বিজ্ঞানের বিকাশ, সাংস্কৃতিক অগ্রগতি, প্রত্যেকটি মানুষের সঠিক বিকাশ নির্ভর করে একদিকে তত্ত্ব সচেতন সংগঠন, নেতা, কর্মীর ওপর এবং অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার যেসব বিষয়গত এবং বিষয়ীগত বিরোধ ও ত্রুটি সৃষ্টি হয়েছে তার বলিষ্ঠ অপসারণের ওপর।

এই সবই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে দ্রুত শক্তিশালী করবে, তৃতীয় বিশ্বকে [illegible] বিশ্বের মানুষের মধ্যে সহমর্মিতা সৃষ্টি করবে এবং পারমাণবিক

যুদ্ধ রোধের সম্ভাবনা সৃষ্টি করবে। এর পরিণামে অস্ত্রমুক্ত বিশ্ব পরস্পর নির্ভরশীল রাষ্ট্রসমূহের এক নতুন ধরনের রাষ্ট্রপুঞ্জ গড়ে উঠবে। এই কারণে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থাকে পার্টি কংগ্রেসে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে গঠনমূলক সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। পার্টি কংগ্রেসে গৃহীত কর্মসূচীতে সমাজতন্ত্রের সাফল্য-গুলিকে আরও বিস্তারিতভাবে তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এতে সমন্বিত হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের অভিজ্ঞতা। সামাজিক সমস্যাগুলি মৌলিক এবং সমষ্টিগতভাবে সমাধান করার জন্য ২৭তম পার্টি কংগ্রেস যেমন নতুন সমাজ গঠনের ভিন্ন ভিন্ন পথের কথা বলেছে তেমনই সমাজতন্ত্র নির্মাণে সাধারণ নিয়মের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। অনেকে সমাজতন্ত্র নির্মাণের জন্য জাতীয় বৈশিষ্ট্যের ওপর প্রধান গুরুত্ব ও প্রাধান্য আরোপ করতে গিয়ে সমাজতন্ত্রের সাধারণ এবং মৌলিক নিয়ম বা সূত্র থেকে বিচ্যুত হন এবং আন্তর্জাতিকতা পরিহার করে নানা রং-এর জাতীয়তাবাদের তত্ত্ব আবিষ্কার করেন এবং আসল সমাজতন্ত্রকে আক্রমণ করে সোভিয়েত-বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করে থাকেন।

বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে সমস্ত রকম বিরোধের মধ্যে মূল এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিরোধ দুই বিপরীত সমাজব্যবস্থার মধ্যে অর্থাৎ সমাজতন্ত্র বনাম পুঁজিবাদ। দুই ধরনের উৎপাদন ব্যবস্থা এবং দুই ধরনের জীবনযাত্রার বিরোধ শান্তিপূর্ণভাবে সমাধান করাই যুক্তিসঙ্গত পথ। এই দুই বিপরীত ব্যবস্থার মধ্যে নিহিত রয়েছে যেমন প্রতিযোগিতা, সংঘাত, তেমনি আবার আলোচনা এবং চুক্তি। এটা হল পারমাণবিক যুগের বৈশিষ্ট্য।

২৭তম কংগ্রেসে বলা হয়েছে পুঁজিবাদের সাধারণ সংকটের যুগে শ্রমিকশ্রেণী ও বুর্জোয়াশ্রেণী, একচেটিয়া পুঁজির সঙ্গে জনগণের বিরোধও বাড়বে এবং তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বহুজাতিক সংস্থার সঙ্গে রাষ্ট্রসমূহের বিরোধ। কারণ বহু-জাতিক সংস্থাগুলি সমাজতান্ত্রিক দেশের বহির্ভূত দেশসমূহে এক-তৃতীয়াংশ জাতীয় উৎপাদন, পুঁজিবাদী বিশ্বের অর্ধেক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করে। সাম্রাজ্য-বাদের সঙ্গে উন্নয়নশীল দেশের বিরোধও গভীর হচ্ছে। উন্নয়নশীল দেশগুলি নয়া-উপনিবেশবাদের শিকার হয়েছে। নয়া-উপনিবেশবাদ হল সদ্যস্বাধীন দেশের প্রধান শত্রু।

সমকালীন বিশ্বে সমস্ত বিরোধগুলি পরস্পরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত।

বেশিরভাগ মানুষের সংগ্রাম বিশ্বরূপ গ্রহণ করছে। শান্তি এবং সমাজ প্রগতির জন্য সংগ্রাম চলবে একসঙ্গে ও যৌথভাবে। এক একটা দেশে শ্রেণীসংগ্রামের রূপ বিভিন্ন রকম হতে পারে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য ; কোথাও সশস্ত্র হতে পারে, আবার কোথাও ভিন্ন রকম হতে পারে।

কিন্তু পারমাণবিক যুদ্ধ, নক্ষত্রযুদ্ধের প্রস্তুতির বিরুদ্ধে পারমাণবিক অস্ত্র সীমিতকরণ ইত্যাদির জন্য সংগ্রাম চলবে প্রধানত বিশ্বজনমত গঠন, বারবার আলোচনা, বৈঠক এবং গঠনমূলক প্রস্তাব, আংশিক বা সামগ্রিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে। এটা হল পরিবর্তিত অবস্থায় সংগ্রাম পদ্ধতির পরিবর্তন। এই পরিবর্তন মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সম্মত। কারণ পরিমাণবিক যুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধে পরিণত করার চিন্তা অবাস্তব। পারমাণবিক যুদ্ধ রোধ ও অস্ত্র সংকোচন এবং নিরস্ত্রীকরণের সংগ্রাম হল সর্বদেশে সর্বব্যাপক। এই সংগ্রাম হল বিশ্বশান্তির জন্য ন্যায়সংগত প্রস্তাবের ভিত্তিতে বিশ্বজনমত সমর্থিত সংগ্রাম।

এর প্রধান দায়িত্ব হল শ্রমিকশ্রেণীর। তারাই বর্তমান যুগে প্রধান বিপ্লবী শ্রেণী। অন্যান্য শোষিত শ্রেণীকে মুক্ত না করে শ্রমিকশ্রেণী যেমন নিজের মুক্তি অর্জন করতে পারে না, তেমনই আজ বিশ্বমানবের নিরাপত্তার জন্য সংগ্রাম না করে শ্রমিকশ্রেণী নিজের নিরাপত্তাও রক্ষা করতে পারে না। অতএব মানবজাতিকে রক্ষা করাই শ্রমিকশ্রেণীর প্রধান কর্তব্য।

পারমাণবিক যুদ্ধের বিপদের বিরুদ্ধে বিশ্বের সর্ব শ্রেণী ও ধর্মের মানুষ, বিভিন্ন ভাষা ও জাতির মানুষের বিরাট বিরাট সমাবেশে শ্রমিকশ্রেণী এখনও বিশ্বমানবের মুক্তিদাতার ভূমিকায় সংগঠিত হতে পারে নি। এ বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া দরকার।

বিশ্বের কমিউনিস্ট আন্দোলনের জনক হল আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণী। বিশ্বের কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিচিত্রতা এবং অনৈক্য একবস্তু নয়। এক একটা দেশের পরিস্থিতি অনুযায়ী সেই দেশের পার্টি তাদের নিজস্ব কর্মকৌশল স্থির করবে। কোন দেশের পার্টি যতই বৃহৎ হোক না কেন সে অন্যদেশের পার্টির ওপর আধিপত্য বিস্তার করবে না বা নিয়ন্ত্রণ করবে না। তাই ২৭তম কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত হল সি পি এস ইউ জাতীয় ও সামাজিক মুক্তি আন্দোলন,

নিরাপত্তার পক্ষে দাঁড়াবে তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবে। বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের ঐক্য গড়ে তোলার জন্য তারা সর্বাত্মক প্রয়াস চালিয়ে যাবে। কিন্তু ঐক্যের ভিত্তি হবে আন্তর্জাতিকতাবাদ, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ। যারা মার্কসবাদের নামে সুবিধাবাদ, সংশোধনবাদ, হঠকারিতার পথ অনুসরণ করবে এবং প্রকৃত সমাজতন্ত্রকে আক্রমণ করবে তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে সোভিয়েত পার্টি দ্বিধা করবে না। কারণ মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিকৃতি বা বিচ্যুতির বিরুদ্ধে মতাদর্শ সংগ্রাম না করে কমিউনিস্ট আন্দোলনের ঐক্য গড়ে তোলা যায় না।

বিশ্ব পরিস্থিতিকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ২৭তম কংগ্রেস মনে করে যে সি পি এস ইউ-র পররাষ্ট্রনীতি তাদের দেশের আভ্যন্তরীণ নীতির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। নতুন পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কিত চিন্তাধারায় এটা সুস্পষ্ট যে পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতা এবং যুদ্ধে কোন পক্ষেরই জয়ী হওয়া অসম্ভব, এমনকি সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের প্রয়াসেও কোন পক্ষ রাজনৈতিক ভাবে লাভবান হবে না। যুদ্ধ সম্পর্কে অতীত যুগের ধ্যান-ধারণা বর্তমান যুগে একেবারে অচল।

বাস্তব পরিস্থিতি বিচারে সমস্ত দিক থেকে সার্বজনীন নিরাপত্তাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। স্থলে, জলে ও মহাকাশে অত্যাধুনিক পারমাণবিক অস্ত্র বিশ্ব-নিরাপত্তাকে কেবল বিপন্নই করতে পারে। একমাত্র রাজনৈতিক উপায়ে সকলের জন্য নিরাপত্তার বিধান সম্ভব। দুই বিপরীত সমাজব্যবস্থার সহ-অবস্থান হল একটা নতুন ধরনের পরস্পর নির্ভরশীল বিশ্ব ব্যবস্থা যেখানে আগ্রাসনের স্থান দখল করবে সমস্ত বিষয়ে সহযোগিতা।

এটাকে বিঘ্নিত করছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। তারাই সর্বপ্রথম হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে এটম বোমা নিক্ষেপ করে মারাত্মক ধ্বংসলীলার সূচনা করে। এখন তারা সেই বিধ্বংসী অস্ত্রে মহাকাশকে সজ্জিত করছে। এখনও মহাকাশ যুদ্ধের কোন পাল্টা প্রতিষেধক আবিষ্কৃত হয় নি। যে কোন মুহূর্তে যে কোন দেশকে মহাকাশ থেকে আক্রমণ করে ধ্বংস করে দিতে পারে।

পারমাণবিক যুগে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী নীতির মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। গ্রানাডাকে আক্রমণ করা বা ভিয়েতনামকে আক্রমণ করাও আগ্রাসী নীতি। বর্তমান যুগে এ ধরনের ঘটনায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পররাষ্ট্র নীতির সামগ্রিক রূপটা প্রকাশিত হয় না। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পররাষ্ট্র

নীতি হল বিশ্বমানব ও সভ্যতাকে ধ্বংস করার জন্য আগ্রাসী নীতি। এই নীতি মানববিদ্বেষী, মানুষের প্রতি চরম ঘৃণাই এর মর্মবস্তু। উপরন্তু এই আগ্রাসী নীতির মধ্যে আরও নতুন উপাদান যুক্ত হয়েছে। সেই উপাদান হল আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ যা হল উন্নয়নশীল দেশগুলিকে লণ্ডভণ্ড করে দেবার অস্ত্র।

বিশ্ব নিরাপত্তার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন বহু ধরনের, আংশিক ও সামগ্রিক প্রস্তাব উপস্থিত করেছে কিন্তু নানা ছলে রেগন তা প্রত্যাখ্যান করে মহাকাশ যুদ্ধের প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছেন। এই কারণে ২৭তম কংগ্রেস সঠিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্যে সমস্ত যুদ্ধবিরোধী সংগঠনগুলির ভূমিকার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে।

২৭তম কংগ্রেসে দুটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা হয়েছে। একটি হল : সাম্য জ্যাবাদ : যুদ্ধ ও শান্তি। অপরটি হল আভ্যন্তরীণ নীতি—Strategy of acceleration বা ত্বরণ নীতি।

Strategy of acceleration বা ত্বরণ নীতি

সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ২৭তম কংগ্রেসে যে ত্বরণ নীতি গৃহীত হয়েছে এবং এখন যে তার রূপায়ণ হচ্ছে তার গোড়া-পত্তন হয়েছে অক্টোবর বিপ্লবে এবং শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বে। ত্বরণ নীতি সমাজতন্ত্র নির্মাণের ধারাবাহিকতার একটা স্তর। শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বে ধনী কৃষকদের উচ্ছেদ করার পর শোষণের শেষ পর্বের অবসান ঘটল। শিক্ষার প্রসার ও সমাজতন্ত্র নির্মাণের প্রাথমিক কাজ শুরু হল। কৃষি সমবায়, রাষ্ট্রীয় খামার ও বৈদ্যুতিকরণের সঙ্গে ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠা হল। এক একটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, ইস্পাত, কয়লা, তৈল ও গ্যাস উৎপাদনের কাজ দ্রুত-গতিতে অগ্রসর হতে থাকে। কৃষিকে সম্পূর্ণভাবে যন্ত্রীকরণ করা হল। এই সময় শ্রমিকশ্রেণী ও তার সহযোগিদের সংগঠিত স্টাকানোভাইট আন্দোলন-কারীরা বিনা পারিশ্রমিকে অতিরিক্ত সময় কাজ করে শিল্প নির্মাণের কাজ করেছে। মানুষ সমাজতান্ত্রিক আদর্শে শিক্ষিত হয়ে এবং ট্রটস্কিপন্থীদের বিরুদ্ধে আদর্শগত সংগ্রাম করে সমাজতন্ত্র নির্মাণের দৃঢ় ভিত্তি স্থাপনের জন্য স্বেচ্ছায় প্রভূত ত্যাগ স্বীকার করেছে। এসব হল শোষণহীন সমাজের বিপ্লবী অবদান। ফ্যাসিস্ট আক্রমণে প্রভূত ক্ষয়ক্ষতি থেকে মুক্ত হয়ে সমাজতন্ত্র

তেল ও গ্যাস উৎপাদনের ক্ষেত্রে সোভিয়েত রাশিয়া অনেক শিল্পোন্নত দেশকে ছাড়িয়ে গেল।

সাধারণ মানুষ যখন সমাজতন্ত্রকে জীবনের আদর্শ বলে গ্রহণ করল তখন রাষ্ট্রের রূপ পরিবর্তন হয়ে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের স্থান দখল করল সমগ্র জনগণের রাষ্ট্র। এ সময়ে অব্যাহত গতিতে শিল্পের অগ্রগতি এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়ে ক্রমে কৃষক ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে অবস্থানগত সীমারেখা বিলুপ্ত হবার প্রক্রিয়া শুরু হল। এই সমাজতন্ত্র নির্মাণের ধারাবাহিকতা হল ২৭তম কংগ্রেসে গৃহীত ত্বরণ নীতির ভিত্তি।

২৭তম কংগ্রেসের পূর্বে সোভিয়েত অর্থনীতিও সমাজে কতকগুলি বিষয়ীগত বিচ্যুতি ও বিষয়গত বিরোধ দেখা দিতে শুরু করল। উৎপাদনে নিম্নগতি, দুর্নীতি, শৃঙ্খলায় শিথিলতা, আমলাতান্ত্রিকতা ইত্যাদির ফলে সমাজতন্ত্র নির্মাণের গতিবেগ ব্যাহত হল। তত্ত্বগতভাবে ও সঠিক সময়ে হস্তক্ষেপ না করতে সমাজতন্ত্র সম্পর্কে লেনিনের ধ্যান-ধারণা ব্যাখ্যা করা হল লঘুভাবে এবং তাতে তার তত্ত্বগত গভীরতা হ্রাস পেতে থাকে। দ্রব্যমূল্য গঠনে বিষয়ীগত মনোভাবের প্রাধান্য, চাহিদা ও সরবরাহ বিধির প্রতি উপেক্ষা, উৎপাদনী শক্তির সঙ্গে উৎপাদন সম্পর্কের বিরোধের ফলে সামাজিক ন্যায়বিচার অর্থাৎ কাজের ভিত্তিতে বণ্টন নীতি ব্যাহত হয়। নতুন নতুন উদ্ভূত সমস্যাবলীর তত্ত্বগত অনুশীলনের অভাবে ত্রুটিগুলি গভীর হয়েছে। তা সত্ত্বেও লক্ষ্যণীয় বিষয় হল যে এর কোন বিরোধই পুঁজিবাদী সমাজের মতো বৈরীমূলক বিরোধ হয় নি। তত্ত্বগতভাবে এসব বিরোধের উৎস সন্ধান করে আরও দ্রুতগতিতে সমাজতন্ত্রকে সমৃদ্ধ করে কমিউনিজমের দিকে যাত্রাপথে এবং প্রস্তুতিতে এইসব ত্রুটি ও বিরোধের সমাধান হতে পারে।

২৭তম কংগ্রেসে গৃহীত ত্বরণ নীতিই (strategy of acceleration) সমাজতন্ত্র থেকে সাম্যবাদে উত্তরণের পথ প্রশস্ত করবে।

এই ত্বরণ নীতি কেবল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অর্থাৎ কম্পিউটার, সুপার কম্পিউটার, রোবট এবং ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের আরও দ্রুত ও সর্বাধুনিক বিকাশের মধ্যে সীমিত নয়। যদিও এর ওপর প্রচণ্ড গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এটা সোভিয়েত সমাজে সংস্কার নয়। গোরবাচভের ভাষায় বলা যায় যে এটা এক ধরনের বিপ্লব। এই ত্বরণ নীতি হল আধুনিক বিজ্ঞান এবং শ্রমশক্তির মধ্যে সচেতন ঐক্য। এর লক্ষ্য পরিমাণগত পরিবর্তন নয়—

সামাজিক ও অর্থনীতিতে গুণগত পরিবর্তন, উপরিকাঠামো, সমাজের সংগঠন ও কাঠামোতেও পরিবর্তন। আর এটা হচ্ছে কমিউনিজমের লক্ষ্যের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। অতএব এই নীতি হল নতুন রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণা। সমাজতান্ত্রিক সমাজে ত্বরণ নীতির বস্তুগত চরিত্র আছে। এই ত্বরণ নীতি সোভিয়েত সমাজে সমস্ত রকম সমস্যার যেমন অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, মতাদর্শ, আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সমস্যাবলীর চাবিকাঠি, সেকেলে সামাজিক প্যাটার্ণ, কাজের পদ্ধতি পরিবর্তনেরও হাতিয়ার।

এর মধ্যে নিহিত আছে সক্রিয় সামাজিক নীতি, সামাজিক ন্যায়বিচারের নীতির ওপর সঙ্গতিপূর্ণ গুরুত্ব আরোপ, সামাজিক সম্পর্কের উন্নতি, রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মপদ্ধতির পরিবর্তন, সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রকে আরও প্রসারিত করা এবং যা কিছু অগ্রগতির পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়াবে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। সমাজের সর্বাঙ্গীণ গুণগত পরিবর্তনই এর লক্ষ্য। এর গতিমুখ হল ক্রমে ক্রমে সাম্যবাদের দিকে অগ্রসর হওয়া।

এই লক্ষ্য নিয়ে সমাজতান্ত্রিক স্ব-শাসন প্রতিষ্ঠার ওপর এই কংগ্রেস বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে দেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে তোলার অর্থ হল উৎপাদিকা শক্তিগুলিতে, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি অগ্রগতিতে এক নতুন শক্তি সঞ্চারিত করা, কর্মক্ষেত্রে মানুষের দক্ষতা বৃদ্ধির সঙ্গে জীবন যাত্রার মানকে উন্নত করা, সমাজতান্ত্রিক স্ব-শাসনকে অবিচলভাবে বিকশিত করে পার্টি এবং সমাজের মধ্যে আরও ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক স্থাপন করা।

এই বিরাট উদ্দেশ্য পূরণের বাহন হল মানুষ এবং সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র। গণতন্ত্রের একটা শ্রেণীভিত্তি আছে। কিন্তু শোষণমুক্ত মানুষের গণতন্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গী হল শ্রমিকশ্রেণীর। রাষ্ট্র পরিচালনা, প্ল্যানিং এবং তার রূপায়ণে মানুষ সক্রিয় অংশগ্রহণ করবে। সাম্যবাদে যাত্রার পথে তারা হবে সক্রিয় শক্তি, মার্কসবাদ লেনিনবাদী তত্ত্বে উদ্দীপ্ত শক্তি। তাই সোভিয়েত পার্টি সমস্ত নাগরিককে মার্কসবাদ-লেনিনবাদী তত্ত্বে শিক্ষিত করে তোলার বিরাট কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। কমিউনিস্ট দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে এই

সামাজিক প্রগতির কেন্দ্রীয় স্থানে প্রতিষ্ঠিত। তারাই হল লক্ষ্য এবং স্রষ্টা। মানবিক উপাদান হল সক্রিয়ক।

এর জন্য চাই আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, সক্রিয় ও দায়িত্বশীল কর্মী আর কাজের পদ্ধতির পরিবর্তন। সেইসঙ্গে সর্বত্র সমষ্টিগত কাজ, গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার দৃঢ় প্রয়োগ। এসব কেবল কমিউনিস্ট পার্টির ক্ষেত্রে নয় সামাজিক সংগঠন, উৎপাদন ও বণ্টনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

আমলাতন্ত্রকে নির্মূল করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। আমলাতন্ত্র হল শাসন পরিচালনার ব্যাপারে জনসাধারণের ব্যাপক অংশকে পুরোমাত্রায় সংশ্লিষ্ট করার বৈরী-উপাদান। বলা বাহুল্য আমলাতন্ত্রই মানুষের স্বাধীন উদ্যোগকে প্রতিহত করে, সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের প্রতিবন্ধক।

সি পি এস ইউ-র বর্তমান কার্যকলাপের ভিত্তিভূমি এই স্ব-শাসনের লেনিনবাদী ধারণাটি মার্কসের পুঁজি গ্রন্থে পর্যালোচিত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অনুসন্ধানের ফলাফলের ওপর প্রতিষ্ঠিত। উৎপাদনের পুঁজিবাদী ধরণ সম্পর্কে তার বিশ্লেষণে দেখা যায় যে শ্রম থেকে সম্পত্তি বিচ্ছিন্ন করতে হলে প্রয়োজন হয় পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠানগুলিতে এক স্বৈরাচারী ধরনের ব্যবস্থাপনা। আর ব্যবস্থাপনা থেকে সম্পত্তি বিচ্ছিন্ন করা হলে সৃষ্টি হয় সম্পত্তির ওপর এমন এক পেশাদারী সরকারী ধরনের নিয়ন্ত্রণ, যে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকে অন্য কারো হাতে, অন্যভাবে বললে, তা ব্যবস্থাপনাকে করে তোলে আমলাতান্ত্রিক।

সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাই হল আমলাতন্ত্রের প্রতিষেধক। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র হল সাম্যবাদের দিকে যাত্রাপথে সমাজতন্ত্রকে আরও উন্নত করা সমস্ত ব্যাপারে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের অর্থ হল সমস্ত সৃজনশীল কাজে শ্রমজীবী মানুষের ক্ষমতা। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল উৎপাদনের ক্ষেত্রে গণতন্ত্র। তবেই সামাজিক জীবনে এর প্রসার হতে পারে।

পার্টি সংগঠন ও কর্মী

সি পি এস ইউ-র কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনারী অধিবেশনে সোভিয়েত সমাজের পরিবর্তন এবং পার্টির কর্মী সংক্রান্ত নীতি বিষয়ে গোরবাচেভ বলেছেন যে আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিচার করে দেশের সামাজিক ও

অর্থনৈতিক বিকাশকে ত্বরান্বিত করতে হবে। ইতিমধ্যে সোভিয়েত সমাজের পুনর্গঠন একটা বাস্তব ঘটনায় পরিণত হয়েছে। আর এই পুনর্গঠন ও ত্বরণ নীতি রূপায়ণের হাতিয়ার হল কমিউনিস্ট পার্টি ও তার কর্মীবাহিনী ও অন্যান্য সংগঠন।

কিন্তু দীর্ঘকাল যাবৎ পার্টিতে পুঞ্জীভূত সমস্যাবলীর সময়মত সমাধান হয় নি। উপরন্তু কর্মীদের রাজনৈতিক, তত্ত্বগত ও মতাদর্শগত শিক্ষাকে লঘু করে দেখার ফলে পার্টিতে নেতিবাচক প্রবণতা, শিথিলতা, গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার অবনতি ঘটতে থাকে। কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে শুরু করে পার্টির প্রাথমিক সংগঠন পর্যন্ত এক বদ্ধাবস্থার আবির্ভাব হয়। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও পলিটব্যুরোর মধ্যে পুঞ্জীভূত সমস্যাবলী পার্টি নেতৃত্বের ধারাবাহিকতা এবং পুনর্নবীকরণের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা হয় নি। এই স্বাভাবিক প্রক্রিয়া ব্যাহত হবার ফলে একটা স্তরে পলিটব্যুরো, সেক্রেটারিয়েট সহ সমগ্র কেন্দ্রীয় কমিটির কাজকর্ম দুর্বল হয়ে পড়ে। এর ফলে পার্টি, রাষ্ট্র ও অর্থনৈতিক সংস্থা-গুলির সম্পর্কের মধ্যে গুরুতর ভুলভ্রান্তি দেখা দেয় এবং সমাজে নেতিবাচক প্রবণতা দেখা দিতে থাকে। অনেক ভুলই এড়ান সম্ভব হত যদি পার্টি কর্মীদের প্রতি নীতিসম্মত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হত, পার্টি নেতৃত্বের মধ্যে এবং অর্থ-নৈতিক পরিচালন ব্যবস্থার মধ্যে দক্ষতার সঙ্গে সমস্ত রকম যোগাযোগ অব্যাহত রাখা হত। কর্মী নির্বাচনের মাপকাঠি, কোন্ কাজে কোন্ কর্মী উপযুক্ত তার বিচার এবং তাদের শিক্ষার প্রতি সবসময় নজর দেওয়া হয় নি। কর্মীদের দায়িত্ব, শৃঙ্খলা, নেতৃস্থানীয় কর্মীদের যৌথ কাজের ওপর যথাযথ দৃষ্টি দেওয়া হয় নি।

সোভিয়েত সমাজের পুনর্গঠন ও ত্বরণ নীতি কার্যকর করতে হলে কর্মীদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি পালটাতে হবে। নতুন কাজ অনুসারে নতুন মালের ভিত্তিতে কর্মী নির্বাচন করতে হবে। এটাই লেনিনের নির্দেশ। সাংগঠনিক মান এবং শৃঙ্খলা উত্তরোত্তর নিম্নগামী হয়েছে। শৃঙ্খলায় শিথিলতা এবং দায়িত্বজ্ঞানের অবনতি পার্টিতে গভীরভাবে প্রবেশ করেছে। দুঃখের হলেও এটা বলতেই হবে। এর জন্য অনেক গুরুতর ঘটনা ঘটেছে। তাতে মানুষের প্রাণহানি হয়েছে।

অতএব শৃঙ্খলা, ত্বরিৎগতিতে কাজ এবং দক্ষতা প্রত্যেকের জন্য বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল—কর্মীদের উচ্চ নৈতিক মান, সততা ও নম্রতা এই বিষয়গুলিকে উৎসাহিত করতে হবে। মাতলামি, ঘুষ,

চুরি-জোচ্চুরি, অফিস ও ক্ষমতার অপব্যবহারের প্রয়াসকে নির্মূল করতে হবে। তবেই সর্বস্তরে কমিউনিস্টদের ভাবমূর্তি পরিচ্ছন্ন থাকবে। মনে রাখা দরকার যে সমাজের পুনর্গঠনের অর্থ হল কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে শুরু করে পার্টির প্রাথমিক সংস্থা এবং সর্বস্তরের কর্মীদের কাজকর্মের পুনর্গঠন। তা না হলে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের প্রয়োগ অসম্ভব।

২৭তম সোভিয়েত পার্টি কংগ্রেস এবং সাম্প্রতিক অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামে মতাদর্শগত কাজের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে বলা হয়েছে এই কাজকে আমাদের জীবনের অঙ্গীভূত করে তুলতে হবে। কেন্দ্রীয় কমিটি এ ব্যাপারে সমস্ত সক্রিয় কর্মী এবং মতাদর্শগত কাজে রত কর্মীদের আরও সক্রিয় করে পার্টির সংগঠনগুলিকে নিখুঁত করার সিদ্ধান্ত করেছে। ২৭তম কংগ্রেসের সম্পর্কে মস্কোয় অনুষ্ঠিত সেমিনারে বলা হয়েছে বর্তমান বিশ্বে মতাদর্শগত সংগ্রাম ব্যতীত আমাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে—এছাড়া আমরা বাঁচতে পারব না। তত্ত্বগত চিন্তার বিকাশের প্রতি শিথিলতা, নিয়ন্ত্রণী শক্তি সমূহকে দ্বন্দ্বমূলক ভাবে অনুশীলন না করা এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিরোধ-গুলি সম্পর্কে সময়মত হস্তক্ষেপের অভাবে জরুরী সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। পার্টি সংস্থাগুলি নীতি-গত অবস্থান থেকে কাজ করতে ব্যর্থ হয়েছে। এই সবই হল তত্ত্বগত ও মতাদর্শগত বিষয়ে শিথিলতার পরিণাম। সমাজ পরিবর্তনের জন্য আলোকবর্তিকা যেমন মতাদর্শ ও তত্ত্ব, তেমন ভ্রান্তিজনিত পতন থেকে উদ্ধারের জন্য এই দুটিই হাতিয়ার।

অতএব গভীর মতাদর্শগত প্রত্যয়, দেশের ভবিষ্যতের প্রতি সম্ভাব্য সর্বাধিক রাজনৈতিক ও নৈতিক দায়িত্ব পালন এবং বলশেভিকবাদের লেনিনীয় নীতি-গুলি অবিচলভাবে মেনে চলা—বর্তমান পরিস্থিতিতে এইগুলিই কর্মীদের (ক্যাডার) কাছে জরুরী দাবি, তাদের ভাবদর্শগত দৃঢ়তা, পার্টি ও রাষ্ট্রীয় শৃংখলা রক্ষা, সম্মান, সততা, শোভনতা, সাধুতা, বিনয়, সমাজতান্ত্রিক নৈতিকতার মানগুলি থেকে কোনরকম বিচ্যুতি বরদাস্ত না করার ব্যাপারে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে।

নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য যারা যখন যেমন তখন তেমন কোন উপায়ে নিজের কর্মজীবনে উন্নতিই যার লক্ষ্য, যে প্রতারণা করে, অর্থ আত্মসাৎ করে, যারা পার্টির সদস্য ও সোভিয়েত কর্মকর্তার পদকে কলঙ্কিত করে, যারা সম্পত্তি

অর্জন, মাতলামি ও অসৎ কাজে মত্ত থাকে তাদের দৃঢ়ভাবে বাতিল করা প্রয়োজন। সংরক্ষণের মনোভাব, স্বজন-পোষণ, জাতিগোষ্ঠী বা ব্যক্তিগত আনুগত্যের ভিত্তিতে কর্মকর্তা মনোনয়নের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে সংগ্রাম চালাতে হবে। যারা অসচ্চরিত্র, তহবিল তছরুপকারীদের আশ্রয় দেওয়ার চেষ্টা করে পার্টি নিয়ম অনুসারে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। কার্যনির্বাহী-দের অকলঙ্কিত ও সততার ভাবমূর্তির জন্য উদ্বেগবোধ থাকা প্রত্যেক পার্টি সংগঠনের প্রধানতম কর্তব্য।

পুনর্গঠনকে গভীরতর করার অর্থ সর্বোচ্চ কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে প্রাথমিক পার্টি সংগঠন পর্যন্ত সর্বস্তরে পার্টির নিজের কাজকর্ম ও তার ক্যাডারদের পুনর্বিন্যাস করা এবং সমস্ত স্তরে পার্টি জীবনের লেনিনীয় নীতি ও মানগুলি সুসঙ্গতভাবে অনুসরণ করা। সর্বক্ষেত্রে পার্টিকর্মীদের সাহায্য করা এবং তাদের উপর ন্যস্ত কাজের জন্য কঠোরভাবে তাদের কাছে থেকে জবাবদিহি নেওয়া প্রয়োজন।

সাংগঠনিক, ভাবাদর্শগত ও রাজনৈতিক দিক থেকে প্রাথমিক পার্টি সংগঠন সমূহকে শক্তিশালী করা ও তাদের সংগ্রামের সামর্থ্য ও ইচ্ছা বাড়ানোই হচ্ছে এলাকাগত পার্টি কমিটিগুলির ও প্রজাতন্ত্র সমূহের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

প্লেনাম শিক্ষাগত ও তত্ত্বগত কাজের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে বলেছে, সিনিয়ার পদের ক্যাডারদের, পার্টি কর্মীদের, সকল কমিউনিস্টকে দৈনন্দিন ভিত্তিতে শিক্ষামূলক কাজ চালাতে হবে। ভাবদর্শগত কাজের দায়িত্ব নিতে হবে সেই সব ব্যক্তিকে যাদের রয়েছে তত্ত্বগত প্রশিক্ষণ। কমিউনিস্ট পার্টি কর্মীদের কাছে যা দাবি করছে সেগুলি হল ভাবদর্শগত দৃঢ়তা, পেশাদারী দক্ষতা, কর্তব্যবোধ, সর্বসাধারণের রায়ের জন্য উপস্থিত ঘটনাগুলির যথার্থতা ও নিভুলতার জন্য দায়িত্ব গ্রহণ ও সমালোচনার প্রতি নীতিনিষ্ঠ পার্টিমনোভাব। এগুলি সাংবাদিক, টেলিভিশন ও বেতার প্রচারকারীদের ক্ষেত্রেও পুরোপুরি প্রযোজ্য।

বলাবাহুল্য পার্টি একটা উপদল, চক্র বা বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিত্বের অনুগামীর সমষ্টি নয়। মার্কসবাদ-লেনিনবাদে সমৃদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টি শ্রমিকশ্রেণী ও নিপীড়িত মানুষকে সংগঠিত করে বিপ্লবকে কেবল পরিচালিত করে না তাকে রক্ষাও করে এবং

সমাজকে পরিবর্তন করে। প্রসঙ্গত লেনিনের 'এক কদম আগে ও দু'কদম পিছে' গ্রন্থটির আন্তর্জাতিক তাৎপর্য আছে এবং তা এখনও আমাদের দেশে কমিউনিস্টদের জন্য সত্য। সঠিক পথে পার্টি গঠনের প্রতি অনীহা বুর্জোয়া শ্রেণীকেই সহায়তা করে। আমাদের মনে রাখা উচিত যে কিছুসংখ্যক ব্যক্তিকে পার্টি সদস্যপদ দিলেই বিপ্লবী পার্টি গড়ে ওঠে না। পার্টি গঠনও একটা বিজ্ঞান ও কলা, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ভিত্তিক সচেতনতার সমষ্টিই হল কমিউনিস্ট পার্টি। মানুষ মরে কিন্তু পার্টি অমর। মানুষ মরে কিন্তু আমাদের মতাদর্শের মৃত্যু নেই। এটা হল চির সৃষ্টিশীল ও বিকাশমান। এই গতিশীলতার পেছনে পড়ে থাকলে পার্টিতে সংকট হবেই, তার জীবনী-শক্তি হ্রাস পাবে, শ্রমিক শ্রেণী ও মেহনতী মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হবে। পার্টি তখন উপদলে বিভক্ত হবে, ব্যবহৃত হবে উপদলের স্বার্থে, পার্টির উচ্চ কমিটি দখল করার জন্য জঘন্য ও অগণতান্ত্রিক পন্থা অবলম্বিত হবে। নিষ্ক্রিয়তার ক্রমবর্ধমান অন্ধকার গোটা পার্টিজীবনকে কলুষিত করবে।

২৭তম কংগ্রেসে সংশোধিত পার্টি সংবিধানে বলা হয়েছে যে পার্টিতে উপদল সৃষ্টি, ঘোট পাকানো ইত্যাদি সদস্য পদের সঙ্গে আদৌ সংগতিপূর্ণ নয় এবং সম্পূর্ণ বেমানান। পার্টি সদস্যদের উপদল সৃষ্টি সমষ্টিগত কাজ ও নেতৃত্বের পরিপন্থী।

প্রসঙ্গত বলা যায় যে প্রথম আন্তর্জাতিকে বাকুনিনের উপদলের বিরুদ্ধে কার্ল মার্ক্সকে তীব্রভাবে সংগ্রাম করতে হয়েছিল। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকে বার্ণ স্টাইনের শোধনবাদী নীতি ও উপদলের বিরুদ্ধে এঙ্গেলস, লেনিন, কার্ল লিবনেক্ট, রোজা লাকজেমবুর্গ প্রমুখ কমিউনিস্ট নেতাদেরও তীব্রভাবে সংগ্রাম করতে হয়েছিল। তৃতীয় আন্তর্জাতিকেও জিনোভিয়েভ ও ট্রটস্কী উপদলের বিরুদ্ধে কমরেড ডিমিট্রভ ও অটো কুসেনিনকে সংগ্রাম করতে হয়েছিল এবং আন্তর্জাতিকের কার্যনির্বাহী কমিটি থেকে জিনোভিয়েভ ও ট্রটস্কীকে অপসারণ করা হয়েছিল। লেনিনের মৃত্যুর পর ট্রটস্কী প্রমুখ নেতাদের বিরাট উপদলকে পার্টি থেকে বহিষ্কৃত করা হয়েছিল।

অতএব ২৭তম পার্টি কংগ্রেসে সংশোধিত পার্টি সংবিধানে সঠিকভাবে বলা হয়েছে যে উপদল সৃষ্টি পার্টি সদস্যপদের সঙ্গে বেমানান ও অসঙ্গতিপূর্ণ।

কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনাম যে দৃষ্টিকোণ থেকে পার্টি ও ক্যাডার সম্পর্কিত নীতি বিচার করেছে সেই দৃষ্টিকোণ হল সংগঠন সম্পর্কে কমিউনিস্ট আদর্শ

জাতিকতার দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই নীতির মর্মবস্তু আমাদের দেশেও প্রযোজ্য।

কর্মদক্ষতা বাড়ানো, শৃংখলা জোরদার করা, পারস্পরিক ভিত্তিতে বেশী কাজ আদায়ের মনোভাব বৃদ্ধির পরিবেশ অত্যন্ত প্রয়োজন। এমন অবস্থা কিছুতেই চলতে দেওয়া যাবে না যাতে উচু পদগুলি দশকের পর দশক ধরে সেই সব লোকজনের দ্বারা ভর্তি হয়ে থাকবে যাঁরা নিজেদের করণীয় কাজই সামাল দিয়ে উঠতে পারছে না।

কর্মীদের মানবিক গুণাবলী ও দক্ষতা, তাদের উচ্চ পেশাগত মানই, ত্রুটিবিচ্যুতি, আমলাতান্ত্রিক ঢিলেমি এবং উদাসীন ও নিষ্ক্রিয় মনোভাব মেনে না নেওয়া আর প্রাগ্রসর ও প্রগতিশীল সব কিছু সম্পর্কে তাদের দায়বদ্ধতা বর্তমান অবস্থায় অতীব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

সমাজ পরিবর্তন ঘটানোর অর্থ কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে প্রাথমিক সংগঠন পর্যন্ত সবস্তরে পার্টি ও তার কর্মীদের কাজ নতুন ভাবে বিন্যস্ত করা। এর অর্থ লেনিনীয় নীতি ও পার্টি জীবনের আচার-আচারণগুলি নীতি-নিষ্ঠভাবে প্রয়োগ করা।

তত্ত্ব ও মতাদর্শগত ক্ষেত্রগুলি সম্পর্কে বিশেষ জোরের সঙ্গে বলা হয়েছে, এই ক্ষেত্রগুলি এমনসব যোগ্যতাসম্পন্ন ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীদের দ্বারা শক্তিশালী করা প্রয়োজন, যেসব কর্মী যুগের স্পন্দন পরিপূর্ণভাবে অনুভব করেন ও অর্পিত কাজের মর্মবস্তু সম্পর্কে যাদের উপলব্ধি আছে এবং পার্টিনীতি প্রচার করতে সক্ষম। তত্ত্বগত ও মতাদর্শ কাজ খুবই ব্যাপক, সঙ্গতিপূর্ণ, অবিরাম ভাবে চালাতে হবে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বিরোধী সমস্ত মতাদর্শ ও ধ্যান-ধারণার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে হবে। বর্তমান যুগে এই সংগ্রাম খুবই তীব্র হয়ে উঠেছে এবং আন্তর্জাতিক রূপ পরিগ্রহ করেছে। ২৭তম কংগ্রেস সম্পর্কে অনুষ্ঠিত সেমিনারে এই কাজের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে বলা হয়েছে যে তত্ত্ব ও মতাদর্শগত সংগ্রাম পরিহার করলে বা তার প্রতি উদাসীন থাকলে বা তাকে ক্ষণস্থায়ী কাজ বলে মনে করলে আমাদের অস্তিত্বই বিপন্ন হবে। একথা স্মরণ রাখা এবং এ কাজে আত্মনিয়োগ করা কমিউনিস্ট পার্টির কর্তব্য। সতর্ক থাকা উচিত যে **তত্ত্ব ও মতাদর্শের দুই ক্ষেত্রে বিপরীত আদর্শের মধ্যে সহঅবস্থান অসম্ভব।**

সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি যেভাবে বিশ্ব-পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেছে

তার আলোকে ভারতের পরিস্থিতি বিচার করলে দেখা যায় যে আমাদের দেশেও দুটি বিরোধ বিদ্যমান। একটি হল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। অপরটি হল সমাজের অগ্রগতির জন্য বুর্জোয়াশ্রেণী ও সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। এই দুই সংগ্রাম পরস্পর থেকে অবিচ্ছিন্ন। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের নামে আভ্যন্তরীণ শ্রেণীসংগ্রাম যেমন বন্ধ করে রাখা যায় না, তেমনই আভ্যন্তরীণ সংগ্রামকে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না।

কেউ কেউ মনে করেন আভ্যন্তরীণ শ্রেণীসংগ্রাম যতই বাড়বে ততই ভারতের বুর্জোয়াশ্রেণী সাম্রাজবাদের পক্ষাবলম্বন করবে। এটা একেবারে ভুল। ভারতের বুর্জোয়াদের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের বিরোধ এত গভীর যে বুর্জোয়া-শাসকবর্গ সাম্রাজ্যবাদের দিকে যেতে চাইলেও যেতে পারছে না। এটা হল বুর্জোয়া শ্রেণীর সংকট। এটা হচ্ছে অসমাপ্ত জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের একটা দিক। উপরন্তু ভারতে নয়া উপনিবেশবাদের অনুপ্রবেশ, ভারতের অস্থিতি-শীল পরিস্থিতি সৃষ্টির চক্রান্ত এবং আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের আমদানী, পাকিস্তানকে পারমাণবিক অস্ত্রে সুসজ্জিতকরণের ঘটনাবলী ভারতের সঙ্গে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরোধকে বাড়িয়ে তুলেছে। আরও লক্ষ্যণীয় যে ভারতের বুর্জোয়া গণতন্ত্র বেঁচে আছে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাহায্য নিয়েই। এই কারণে বুর্জোয়া শাসকেরা যতই বহুজাতিক সংস্থাকে সুযোগ দিক না কেন, যতই বিদেশী একচেটিয়া পুঁজির সঙ্গে সহযোগিতা করুক না কেন, তারা এখনও অপেক্ষাকৃত স্বাধীন পুঁজিবাদী পথ অনুসরণ করতে সক্ষম হচ্ছে। বিশ্ব পরিস্থিতির এক একটা সন্ধিক্ষণে ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণীর দ্বৈত চরিত্রের রূপ পরিবর্তন হয় কিন্তু দ্বৈত চরিত্র বিলুপ্ত হয় না। আজ ভারতের বুর্জোয়াশ্রেণীর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতাও হচ্ছে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের চৌহদ্দির মধ্যেই। স্বভাবতই শ্রমিকশ্রেণীর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার সঙ্গে তার মৌলিক পার্থক্য থাকবেই।

তথাপি বিশ্বব্যাপী যে মূল প্রশ্নটি মানবসভ্যতাকে বিপদের দিকে ঠেলে দিয়েছে, সেই প্রশ্নে এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের স্থলে ও আকাশে পারমাণবিক যুদ্ধ প্রস্তুতির বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে ভারত ও অন্যান্য সদ্য স্বাধীন দেশ দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছে। তা নাহলে বিশ্বশক্তির ভারসাম্য পরিবর্তন হয়ে রেগন বা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অনুকূলে চলে যেত। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

ও জাতীয় নিরাপত্তার আলোকে এটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই ২৭তম সোভিয়েত পার্টি কংগ্রেসে সাম্রাজ্যবাদ-যুদ্ধ-শান্তির প্রশ্নটি সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব পেয়েছে।

এই মূল প্রশ্নটির সমাধান হলে অস্ত্রমুক্ত পৃথিবী হয়ে উঠবে পরস্পরনির্ভরশীল ও সুপ্রতিবেশীসম্পন্ন রাষ্ট্রপুঞ্জ। কেবল তা নয় যেসব সদ্যস্বাধীন দেশগুলিতে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব এখনও অসমাপ্ত রয়েছে, তাকে সমাপ্ত করার পথে এক বিরাট বাধার অপসারণ হবে।

রুশদেশে ১৯১৭ সালে অক্টোবর বিপ্লব যেমন পরাধীন দেশে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে সাহায্য করেছিল, পরাধীন দেশের মানুষের মধ্যে যেমন নতুন প্রেরণা ও আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করেছিল, তেমনই সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি কংগ্রেসে গৃহীত উন্নত সমাজতন্ত্র থেকে সাম্যবাদে উত্তরণের সিদ্ধান্ত ও পথনির্দেশ এবং তার সাফল্য কেবল বিশ্ববিপ্লবী প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করবে না, আমাদের দেশে অসমাপ্ত বিপ্লবকে সমাপ্ত করার গতিবেগকে বাড়িয়ে তুলবে।

গান্ধীজী প্রসঙ্গে

সুকুমার মিত্র

গান্ধীজী ও তাঁর মতবাদ সম্পর্কে সারা পৃথিবীতে বহু রাজনৈতিক নেতা ও পণ্ডিত তাঁদের অভিমত প্রকাশ করেছেন, বই লেখা হয়েছে শত শত। এঁদের মধ্যে বাছা বাছা কয়েকজন রাজনৈতিক নেতা ও বুদ্ধিজীবীর অভিমত ও মন্তব্য এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। প্রথমেই ভারতবর্ষের সমাজ-তন্ত্রবাদের অন্যতম পথিকৃৎ ডঃ ভূপেন্দ্র নাথ দত্তের অভিমত দিয়েই প্রবন্ধের সূচনা করছি।

বিস্ময়ের কথা হলেও সত্য যে, সোভিয়েত পণ্ডিত উলিয়ানভস্কির অনেক আগে সম্ভবতঃ তাঁর জন্মের আগেই ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত গান্ধীজীর মতবাদকে ইউটোপিয়ান সোস্যালিজম বলে আখ্যায়িত করেন। ১৯২৬ সালে অনুষ্ঠিত গুয়াহাটি নির্যাতিত ভারতীয় হিন্দীদের এক সম্মেলনে ডঃ দত্ত তাঁর অভিভাষণে বলেন যে, আমেরিকার থোরোর Civil Disobedience (আইন অমান্য নীতি), রুশীয় টলস্টয়ের অহিংস নীতি, ইংলণ্ডের খৃষ্টীয় সোস্যালিস্টদের Cottage Industry (কুটির শিল্প) এবং আমেরিকার হেনরি জর্জের Industrial Capitalism (মূলধনীয় শিল্পপ্রসার প্রচেষ্টা) রূপ অর্থনীতির প্রতিরোধার্থ Hadicrafts and Cottage Industry (হস্ত ও কুটীর শিল্প পুনঃপ্রচারের আন্দোলন), ফ্রান্সের সিণ্ডিকালিষ্ট শ্রমিক দলের সশস্ত্র বিপ্লব অসম্ভব বলে Passive Resistance—নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ, প্রভৃতি আন্দোলন প্রচেষ্টার সংমিশ্রণে গান্ধীবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। এক কথায় উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপে Utopian Socialism বলিয়া যাহা চলিত বিংশ শতাব্দীর ইউরোপে যেসব মত ও পথ পরিত্যক্ত হইয়াছে তাহা এখন ভারতে 'গান্ধীবাদ' নামে চলিতেছে।

ডঃ দত্তের মতে গান্ধীবাদে ভারতীয় বা হিন্দু ভাবধারা নাই। তাঁহার মতে বেদের পরের যুগ থেকে অহিংসবাদ ভারতে চালু হলেও বৌদ্ধ ও জৈন রাজা বা সম্রাটরা কেউই অহিংস নীতি অনুসরণ করেন নি। সম্রাট অশোক

থেকে বাংলার বৌদ্ধ পাল রাজারা সকলেই যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থেকেছেন। অশোক তাঁর অনুশাসন জোর করে জনসাধারণের উপর চাপিয়ে দিয়েছিলেন, অনুশাসন অমান্য করলে কঠোর দণ্ড দেওয়া হতো।

কাজেই ভারতীয় অহিংসবাদ থেকে গান্ধীজী কিছু নিয়েছিলেন বলে ডঃ দত্ত মনে করেন না। তিনি মন্তব্য করেছেন: "গান্ধীবাদের কিছুই বেদ ও কোরাণ হইতে উদ্ভূত নহে। অবশ্য ইহাই ভারতের একমাত্র 'জাতীয়তাবাদ' বলিয়া সাদরে গৃহীত হইয়াছে। ইহাকেই বলে শ্রেণীস্বার্থ।"

(ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম: অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাস— প্রথম খণ্ড পৃঃ ১০২-১০৪)

ডঃ দত্তের সময় থেকে আজ পর্যন্ত ডঃ দত্ত গান্ধীবাদকে প্রতিক্রিয়াশীল বলেই সিদ্ধান্ত করেছিলেন।

গান্ধীজীর জীবন এবং তাঁর মতবাদ নিয়ে ভারত সহ বিভিন্ন দেশের পণ্ডিত ব্যক্তিরা আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন ব্যাপকভাবে। নতুন করে গান্ধীজী ও তাঁর মতবাদের মূল্যায়নের চেষ্টা চলেছে কমিউনিস্ট ও অ-কমিউনিস্ট উভয় মহলেই।

এই মূল্যায়ন প্রচেষ্টায় বিদেশী পণ্ডিতদের মধ্যে সোভিয়েত পণ্ডিত উলিয়ানভস্কির উল্লেখই প্রথম করতে হয়। তাঁর মূল বক্তব্য সংক্ষেপে প্রকাশিত হয়েছে "ফাইটার্স ফর ন্যাশনাল লিবারেশন" গ্রন্থে। তিনি সঠিক-ভাবেই গান্ধীজীর জীবন ও মতবাদের ইতিবাচক দিকগুলি তুলে ধরেছেন। কিন্তু তা করতে গিয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও এড়িয়ে গেছেন। এখানে তার কয়েকটি বক্তব্য নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করছি।

তিনি সঠিকভাবেই বলেছেন যে, স্বাধীনতা উত্তর ভারতে বৃহৎ বুর্জোয়া বা বাঘা বাঘা ধনপতিরা ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি তাদের সংকীর্ণ শ্রেণীস্বার্থে গান্ধীবাদের ব্যাখ্যা করছে এমনভাবে যাতে গান্ধীবাদ গণ-আন্দোলনের বিরুদ্ধে যায়। ধনিক শ্রেণীর এই প্রচেষ্টা গান্ধীজী কংগ্রেসের নেতৃত্ব গ্রহণের সময় থেকেই শুরু হয়েছিল। এবং বর্তমানে তা' আরও প্রবল হয়ে উঠেছে।

উলিয়ানভস্কি গান্ধীবাদের ইতিবাচক দিকগুলির উপর জোর দিয়ে বলেছেন যে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের সঙ্গে গান্ধীবাদের কোন কোন ক্ষেত্রে মিল আছে। এই প্রসঙ্গে তিনি 'সর্বোদয়' চিন্তাধারার উল্লেখ

করেছেন। তাঁর মতে এই চিন্তাধারা কল্পনাশ্রয়ী ও সেকেলে হলেও এর মধ্যে জনগণের কল্যাণ সাধনের ও মেহনতি মানুষের অবস্থার উন্নতি বিধানের এবং সামাজিক ন্যায়সমন্বিত সমাজ প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে। তাই উলিয়ানভস্কি বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ যাঁরা অনুসরণ করেন তাঁদের সঙ্গে গান্ধীবাদীদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের কথাও ভেবেছেন। অথচ তিনি নিজেই লিখেছেন যে, আজ স্বাধীন ভারতে "দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় যে গান্ধীর মতবাদ কোটি কোটি মেহনতি মানুষের অবস্থায় কোন বড় রকমের পরিবর্তন ঘটাতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ বলে প্রমাণিত হয়েছে।" (ফাইটার্স ফর ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লিবারেশন, পৃঃ ২৪)

তিনি এ কথাও বলেছেন যে, আজ গান্ধীবাদ যারা অনুসরণ করেন তাঁরা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ থেকে সরে যাওয়ার দুঃখজনক প্রবণতা দেখাচ্ছেন।

এরপর আর গান্ধীবাদীদের সঙ্গে সমাজতন্ত্রবাদী বা কমিউনিস্টদের ঐক্যের কোন প্রশ্নই ওঠে না। উলিয়ানভস্কির গান্ধী ও গান্ধীবাদী মতবাদের মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণে কিছু কিছু ত্রুটি থাকলেও এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, তিনি এই মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।

এই অবদান নিম্নরূপ :

১) গান্ধীবাদ মূলতঃ একটি মধ্যবিত্তসুলভ কল্পনাশ্রয়ী (utopean) মতবাদ যাতে ভারতবর্ষের কৃষকদের মতাদর্শই প্রতিফলিত হয়েছে। এই মতবাদ অর্থাৎ গান্ধীবাদ ভারতীয় কৃষকদের সেকেলে ও অনগ্রসর চিন্তাধারার উপর প্রতিষ্ঠিত হলেও এর কয়েকটি ইতিবাচক ও প্রগতিশীল দিক আছে :

২) গান্ধীবাদ ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী হওয়ার ফলেই ভারতবর্ষের কোটি কোটি মানুষকে গান্ধীজী সহজেই প্রভাবিত করতে সমর্থ হন।

৩) গান্ধীজী দেশের স্বাধীনতা অর্জনকেই অগ্রাধিকার দেন এবং স্বাধীনতা লাভের পর তাঁর 'রামরাজ্য' প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা চালাবেন বলে স্থির করেছিলেন। এ ব্যাপারে ভারতীয় ধনিকশ্রেণী তাঁর সঙ্গে একমত হন এবং গান্ধীকে নেতারূপে গ্রহণ করে গণ আন্দোলনের পথে অগ্রসর হতে উদ্যোগী হন। তাঁরা বুঝেছিলেন যে, একমাত্র গান্ধীজীই জনগণকে আন্দোলনের মধ্যে টেনে আনতে পারবেন, আবার তাঁর অহিংসা ও প্রেমের বাণীর সাহায্যে জনগণকে সংযত রাখতেও পারবেন। এই কারণেই কংগ্রেসের জাতীয়

বুর্জোয়াদের সঙ্গে গান্ধীজীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কাজেই গান্ধীজী জনগণের প্রতিনিধি রূপে রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় বুর্জোয়াদেরও প্রতিনিধি হয়ে ওঠেন।

৪) গান্ধীজী সামন্ততন্ত্র বিরোধী ছিলেন না। তিনি কখনও জমিদার ও দেশীয় রাজন্যবর্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালানোর কথা ভাবেন নি। বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে তিনি যখন জমিদার বা দেশীয় রাজন্যবর্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাতে বাধ্য হন তখনও তিনি আন্দোলনকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রেখে জমিদার ও রাজন্যবর্গের মধ্যে কোন উদ্বেগ সৃষ্টি না হয় তার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন;

৫) গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগিতার বা নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলন শান্তিপূর্ণ সংগ্রামের পদ্ধতি। এই পদ্ধতি গান্ধীজী অনুসরণ করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর ব্যর্থতার কারণ অন্যত্র নিহিত (উলিয়ানভস্কি এই কারণটি পরিষ্কারভাবে দেখান নি)।

৬) গান্ধিজীর অহিংসা পথ ভারতের নিজস্ব পথ, ভারতের ঐতিহ্যবাহী। উলিয়ানভস্কির এই সিদ্ধান্তের সমালোচনা হয়েছে, কিন্তু মোটের উপর তিনি ঠিক কথাই বলেছেন। কারণ ভারতবর্ষে বিভিন্ন যুগে বহু সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটলেও এক গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবের পর ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যের বিরুদ্ধে ক্ষত্রিয় বৈশ্যদের অভ্যুত্থান প্রকৃত বিপ্লব ঘটায়। এর পর আর কোন বিপ্লব ঘটে নি। জনগণ যা কিছু করেছে তা শান্তিপূর্ণ পথেই করেছে। অথবা নিঃশব্দে সব শোষণ ও অত্যাচার সহ্য করতে বাধ্য হয়েছে। অবশ্য এই বাধ্যতামূলক অহিংসাকে প্রকৃত অহিংসা বলা যায় কিনা সন্দেহ কারণ গান্ধীজীও এই ধরনের অহিংসাকে কাপুরুষের অহিংসা বলে অভিহিত করেছেন এবং এর চাইতে সহিংস পথও শ্রেয় বলতেও দ্বিধা করেন নি।

এবার একটু অতীতের দিকে তাকানো যাক। গান্ধীজীর আন্দোলন সম্পর্কে লেনিন মানবেন্দ্রনাথ বিতর্ক সুবিদিত। তাঁদের কথা পরে আলোচনা করা যাবে। এখন ইতালীর প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা ও তাত্ত্বিক গ্রামসুচি গান্ধীজীর আন্দোলন সম্পর্কে যে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন সংক্ষেপে তা তুলে ধরার চেষ্টা করছি। আন্তোনিও গ্রামসুচি (১৮৯১ ১৯৩৭) ইতালীর ফ্যাসিস্ট কারাগারে বন্দী থাকার সময় তাঁর "প্রিজন নোটবুকস" বা কারাগারে লিখিত খসড়া খাতায় লেখেন যে, "গান্ধী আন্দোলনগুলিতে প্রতিফলিত

হয়েছে মিশ্র সংগ্রামের রূপগুলি—মূলত সামরিক চরিত্রের, কিন্তু প্রধানত লড়াইটা চলেছে রাজনৈতিক স্তরে।"

গান্ধীজীকে উঁচুদরের রণনীতি বিশারদ (গ্রামস্‌চি ফ্যাসিবাদ বা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে বিচার করেছেন সামরিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করে) বলে প্রশংসা করে গ্রামস্‌চি লিখেছেন যে, "যে দেশ কার্যত নিরস্ত্র ও সামরিক দিক থেকে হীনবল এবং কারিগরী দিক থেকে উন্নত ও শ্রেষ্ঠ দেশগুলির দ্বারা শাসিত এই ধরনের সংগ্রাম সেই দেশের পক্ষে উপযোগী।"

"গান্ধীর নিরুপদ্রব প্রতিরোধ হল এক অবস্থানগত যুদ্ধ (ওয়ার অব পজিশন) যেমন বয়কট যা কোন এক মুহূর্তে গতিশীল যুদ্ধে (মুভমেন্ট অব ওয়ার) পরিণত হয় যেমন ধর্মঘট।" এরপর গ্রামস্‌চি তাঁর তত্ত্ব অনুযায়ী গোপন যুদ্ধপ্রস্তুতির কথাও বলেছেন।

গ্রামসচি গান্ধীজীর মূল নীতিগুলিকে মেনে নেন নি, বরং সেগুলির তীব্র সমালোচনা করেছেন। গান্ধীবাদকে তিনি খৃষ্টধর্মের প্রথম পর্যায়ের তুল্য মনে করেছেন এবং মন্তব্য করেছেন "গান্ধীবাদ ও তলস্তয়বাদ ধর্মীয় ভাবমিশ্রিত 'নিষ্ক্রিয় বিপ্লবের সরল তত্ত্বায়ন।" সামরিক দিক থেকে বিচার বিশ্লেষণ করে, একটি বিশেষ দেশের বিশেষ পরিস্থিতিতে গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলনের মূল্যায়ন করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন এই ধরনের আন্দোলন এগিয়ে যেতে পারে। গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলনের বৈপ্লবিক সম্ভাবনাকে গ্রামস্‌চি তুলে ধরেছিলেন একটি পরাধীন ও দুর্বল দেশের পক্ষে অতি দুর্ধর্ষ ও শক্তিমান প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে। লড়ে সাফল্যলাভ করতে গেলে দীর্ঘমেয়াদী রাজনৈতিক রণনীতির একান্ত প্রয়োজন এই সিদ্ধান্ত থেকেই গ্রামস্‌চি গান্ধীজীর রাজনৈতিক রণনীতির সবিশেষ গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন।

অবশ্য তিনি গান্ধীজী যে কোন আপসহীন সংগ্রাম করতে প্রস্তুত ছিলেন না এবং কেন ছিলেন না তা বুঝতে পারেন নি। ভারতীয় ধনিকশ্রেণীর ভূমিকা নিয়ে তিনি কোন আলোচনা করেন নি। গ্রামস্‌চি উলিয়ানভস্কির আন্দোলনের 'ভারতীয় ঐতিহ্য'কে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মত (১৯৩১ সালের ৫ই অক্টোবর তারিখের একটি পত্রে) "হিন্দুরা (ভারতীয় অর্থে—লেখক) লড়ুয়ে জাতি", "মোংগোল আক্রমণ ও ইংরেজদের জয়লাভের পরেই তারা গান্ধীর মত একটি লোককে পেতে সক্ষম হয়।"

যাই হোক অন্যান্য অনেক বিষয়ে গ্রামসৃচির সঙ্গে উলিয়ানভস্কির বিচার-বিশ্লেষণের মিল লক্ষ্য করা যায়।

এখন আবার আধুনিক কালের দিকে তাকিয়ে আমরা দেখতে পাই গান্ধীজী সম্পর্কে ব্রিটিশ কমিউনিস্ট নেতা ও তাত্ত্বিক রজনী পাম দত্ত এবং মানবেন্দ্রনাথ রায়ের মূল্যায়ন।

তৃতীয় আন্তর্জাতিকের ষষ্ঠ কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের দ্বারা প্রভাবিত ব্রিটেনের মার্কসবাদী পণ্ডিত ও কমিউনিস্ট নেতা রজনীপাম দত্ত গান্ধীজীর সম্পর্কে তাঁর যে ধারণা 'ইণ্ডিয়া টুডে' গ্রন্থে প্রকাশ করেছেন তার সঙ্গে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের প্রথম দিকের ধারণার সঙ্গে অনেক মিল আছে। তফাৎ এই যে, রজনীপাম দত্তের ধারণার কোন পরিবর্তন তাঁর জীবনকালে হয় নি, পক্ষান্তরে মানবেন্দ্রনাথের শেষ জীবনে গান্ধীজীর সম্পর্কে তাঁর ধারণা সম্পূর্ণ পাল্টে গিয়েছিল।

মানবেন্দ্রনাথের (১৮৮৭-১৯৬১) ধারণার ক্রমবিবর্তন ঘটে দীর্ঘকাল ধরে। "ইণ্ডিয়া ইন ট্রানজিশন" গ্রন্থেই মানবেন্দ্রনাথ প্রথম বিস্তারিতভাবে গান্ধীজীর সমালোচনা করেন।

ভারতবর্ষে কংগ্রেসের নেতৃত্বে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন সম্পর্কে লেনিন-মানবেন্দ্রনাথ বিতর্কের কথা সকলেরই জানা আছে। মানবেন্দ্রনাথ তখন অতি বাম দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করে সরাসরি শ্রমিকশ্রেণী তথা কমিউনিস্ট নেতৃত্বে উপনিবেশগুলিতে বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তোলার উপর জোর দেন। গান্ধী-বাদ একটি প্রতিক্রিয়াশীল মতাদর্শ কাজেই তা বিপ্লবের পথে বড় রকমের বাধা হয়ে দাঁড়াবে। এটাই ছিল মানবেন্দ্রনাথের মূল প্রতিপাদ্য। তিনি একথাও মনে করেছিলেন যে গান্ধীজী ভারতীয় জনগণের মধ্যযুগীয় মনোবৃত্তির প্রতি আবেদন জানিয়ে তাদের মধ্যে আলোড়ন এনেছেন কিন্তু 'এখন (অর্থাৎ "ইণ্ডিয়া ইন ট্রানজিশন" রচনাকালে) গান্ধীবাদের প্রভাব "হ্রাস পাচ্ছে"। তাঁর ভাষায় গান্ধীবাদ "সংকটের সম্মুখীন হয়েছে" এবং এক "আসন্ন অবলুপ্তির প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির পতনের এবং রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত বহন করে আনছে।"

লেনিনের সঙ্গে বিতর্কের পরও মানবেন্দ্রনাথের গান্ধীজীর সম্পর্কে ধারণার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নি। তিনি গান্ধীজীর নেতৃত্বে পরিচালিত

গণ আন্দোলনকে বিপ্লবী আন্দোলনে রূপান্তরিত করার স্বপ্নই দেখেছেন দীর্ঘদিন ধরে।

১৯২৯ সালের ডিসেম্বর মাসে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার পর মানবেন্দ্রনাথ নীতিধর্ম বর্জিত বলে মার্কসবাদকে অভিহিত করলেও গান্ধীবাদকে মেনে নিতে পারেন নি ত্রিশের দশকেও। তখন তাঁর কাছে গান্ধীবাদ দর্শন নয়, একটা ধর্ম বলেই প্রতিভাত হয়েছিল। কারাগার থেকে মুক্তিলাভের পর মানবেন্দ্রনাথ বুঝতে পারেন যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হলে কংগ্রেসে যোগ দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। এই সময় থেকে তিনি গান্ধীজীর সঙ্গে একটা আপসরফার চেষ্টা করেন এবং সুভাষ চন্দ্রকে সমর্থন না করে গান্ধীজীর অনুগামীদেরই সমর্থন করেন। এই সময় তিনি এক প্রবন্ধে গান্ধীজীকে ভারতবর্ষের অনগ্রসর জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা জাগিয়ে তোলার জন্য গভীর শ্রদ্ধা জানান।

কিন্তু তখনও তিনি গান্ধীবাদকে প্রতিক্রিয়াশীল এবং ভবিষ্যতে বিপ্লবের পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে বলে মনে করতেন। গান্ধীজী যে গণ আন্দোলন সৃষ্টি করেছিলেন তার জন্যই তিনি তখন তাঁকে শ্রদ্ধা জানানো ও প্রশংসা করা উচিত বলে মনে করেন।

১৯৪৬ সাল থেকে মানবেন্দ্রনাথের চিন্তাজগতে বিরাট পরিবর্তন ঘটতে থাকে। কমিউনিজম ও জাতীয়তাবাদের তীব্র বিরোধী হয়ে উঠে মানবেন্দ্র নাথ তাঁর নিজস্ব মতবাদকে পরিষ্কারভাবে উপস্থাপিত করার প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীবাদের বেশ কাছাকাছি চলে আসেন (যদিও এবিষয়ে রায়পন্থীদের মধ্যে মতভেদ আছে।) এবং দেশ বিভাগের পর উন্মত্ত সাম্প্রদায়িকতা প্রশমিত করার জন্য গান্ধীজীর আপ্রাণ চেষ্টা মানবেন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করে।

গান্ধীজী নিহত হওয়ার পর তিনি স্পষ্ট ভাষায় লেখেন যে গান্ধীজীর বাণী হল "মূলত এক নৈতিক, মানবিকতাবাদী ও বিশ্বজনীন আবেদন।" আর এটাই আজ ভারতের সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন।

গান্ধীজীর বাণী এবং তার প্রচারিত জাতীয়তাবাদের মধ্যে যে স্ববিরোধিতা আছে তাও মানবেন্দ্রনাথ দেখিয়ে দেন।

গান্ধীজীর মৃত্যুর এক বছর পরে মানবেন্দ্রনাথ তাঁর এক প্রবন্ধে লেখেন :

'একমাত্র সত্য ও অহিংসার দ্বারা রাজনীতিকে পবিত্র করে তোলার

নৈতিক উপদেশকে বাস্তবে পরিণত করার চেষ্টাই মহাত্মার স্মৃতিকে অমর করে রাখবে। চুনসুরকি ও পাথরের স্মৃতিস্তম্ভ বিলুপ্ত হবে কিন্তু সত্য ও অহিংসার পবিত্র বাণীর আলো চিরকাল উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।"

এইভাবেই এককালের কমিউনিস্ট মানবেন্দ্রনাথ প্রগতিশীল মানবিকতাবাদীতে পরিণত হয়ে গান্ধীজীর মূল্যায়ন করেছিলেন। এই-ভাবেই তিনি গান্ধীজীর চিন্তাধারাকে তাঁর চিন্তাধারার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছিলেন। বিশেষ করে রাজনীতি ও ক্ষমতার ক্ষেত্রে উভয়ের চিন্তাধারা মিলে গিয়েছিল। উভয়েই অভীষ্ট ও অভীষ্টলাভের উপায়ের মধ্যে কোন বিরোধ থাকা উচিত নয় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন।

এখন শীর্ষস্থানীয় কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবীরা গান্ধীজীর মূল্যায়ন কিভাবে করেছেন তা লক্ষ্য করা যাক। গোপাল হালদার লিখেছেন, সাধারণভাবে দেশে বিদেশে অনেক লোকই গান্ধীজীকে সুচতুর রাজনীতিক বলে বসেন। তাদের কথা কতটা সত্য? অনেক সদগুণের অধিকারী গান্ধী এমন কি, অনেক ক্ষেত্রে চতুরতারও, আর পৃথিবীর শান্তির আদর্শেরও। কিন্তু ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রধান ক্ষেত্রে তিনি কোনো চতুরতার পরিচয় দিতে পেরেছেন মনে হয় না। স্মরণ করা উচিত—গান্ধী আরুইন চুক্তির ক্ষেত্রে তাঁর ব্যর্থতা, গোলটেবিল বৈঠকে শুধু তাঁর ব্যর্থতা নয়, গুরুতর রকম জাতির ক্ষতি, আরো বেশী ব্যর্থতা—হিন্দু ও মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনে তাঁর অক্ষমতা। বাঙ্গালীদের দেশবন্ধুর 'সাম্প্রদায়িক চুক্তি' (১৯২৬), ফজলুল হকের সঙ্গে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গঠনে সম্মতি না দিয়ে সেরূপ একটা সাম্প্রদায়িক বোঝাপড়ার সুযোগ একবারও গ্রহণ না করা, এসবে তাঁর রাজনৈতিক বিচক্ষণতার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তিনি ভারতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রধান পুরুষ, কিন্তু জাতীয় নিয়তির সংগঠকও নন, পরিচালকও নন। অবশ্য মানুষ হিসাবে তিনি বোধহয় তৎকালীন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ এক মানুষ—ভাগ্য লাঞ্ছিত, কতকাংশে আত্ম প্রতারিত।

(রূপনারাণের কূলে—গোপাল হালদার পরিচয়,—অগ্রহায়ণ, ১৩৮৯ ইং, ডিসেম্বর, ১৯৮২)

অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর ইংরাজী "গান্ধীজী : এ স্টাডি" গ্রন্থে গান্ধীজী ও তাঁর কর্মকাণ্ড ও মতবাদের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুটি দিকই তুলে ধরেছেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, ভারতের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে কেবলমাত্র গান্ধীজির জন্য এ কথা ঠিক নয়।

ইতিহাসের কোন ছাত্র কখনই স্বীকার করতে পারবে না যে, শুধু গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলন ভারতকে স্বাধীন করেছে। ভারত স্বাধীনতা অর্জন করেছে দীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে, বিশেষ করে ১৯৪৫-৪৬-এর বিরাট গণ-অভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে। সত্যাগ্রহ আন্দোলনের বিরাট অবদান অনস্বীকার্য, তা' ভারতবর্ষের কোটি কোটি মানুষকে জাগিয়ে তুলেছিল, তবু শুধু ঐ পথে ভারত স্বাধীনতালাভ করতে পারত না।

..."গান্ধীজী' একধারে রক্ষণশীল ও বিপ্লবী'। তাঁর সমস্ত স্ববিরোধিতা, সমস্ত ব্যর্থতা সত্ত্বেও গান্ধীজী এক মহাপুরুষ এই হল হীরেন মুখার্জীর মূল বক্তব্য। তিনি তাঁর গ্রন্থের শেষদিকে লিখেছেন, "তবু আধুনিক ভারতীয় ইতিহাসের সমস্ত বীরদের মধ্যে এই দুর্বল খর্বকায় মানুষটিই শীর্ষস্থানীয়। পৃথিবীতে শান্তি ও সমস্ত মানুষের মধ্যে সদিচ্ছা যখন রূপলাভ করতে যাবে তখন গান্ধীর মতন একজনেরই কণ্ঠস্বর ক্রমেই তীব্রও স্পষ্টভাবে এবং ক্রমবর্ধমান সম্মানের সঙ্গে শ্রুত হবে।" (গান্ধীজী : এ স্টাডি—পৃ : ২০২)

এবার যে 'যুগান্তর' বিপ্লবী দ'ল গান্ধীজীর নেতৃত্বে পরিচালিত কংগ্রেসের মধ্যে আত্মবিলুপ্তি ঘটিয়েছিল সেই দলের শীর্ষস্থানীয় বিপ্লবী (যুগান্তর দলের) দুইজন নেতা গান্ধীজী সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করতেন তা' লক্ষ্য করা যাক। ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় নিজে গান্ধীজীর সঙ্গে আলোচনা করে প্রথম দিকে (যখন বিপ্লবী সংগঠন বজায় রেখে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানের সিদ্ধান্ত 'যুগান্তর' নেতারা গ্রহণ করেছিলেন) লিখেছেন : "ভাবলাম এঁর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি একদিন অবধারিত। এক সঙ্গে যতটা চলা যায়, যাওয়া হোক। আমি তাঁকে সেদিন থেকে আর ভুল বুঝি নি। গান্ধীজী সর্বপ্রথম সাধু, তারপর রাজনীতিক।" (বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি, পৃঃ ৯২) ভূপেন্দ্র কুমার দত্ত শেষ পর্যন্ত গান্ধীজীকে বিপ্লবী রূপেই দেখেছেন। প্রথম দিকে শ্রীঅরবিন্দের উপদেশ মতো অহিংসাকে ধর্মরূপে (fetish) গ্রহণ না করে নিজেদের বিপ্লবী সংগঠন বজায় রেখে গান্ধীজীর আন্দোলনে যোগ দিলেও

পরে জেলে থাকা কালে ভূপেন্দ্রনাথ তাঁর যে চিন্তাধারা লিপিবদ্ধ করেন তা নিম্নরূপ :

"গান্ধীবাদের সঙ্গে যেন আমাদের সামঞ্জস্য চোখের সামনে ভেসে উঠল।" গান্ধীবাদের শ্রেণীহীন সমাজের আদর্শই তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল। গান্ধীজীকে বিপ্লবী রূপেই তিনি গ্রহণ করলেন। তিনি লিখেছেন : মানুষের এই মর্যাদাবোধই গান্ধী সত্যাগ্রহের শাণিত অস্ত্র।"

যখন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নব নব মারণাস্ত্র আবিষ্কৃত হচ্ছে তখনই "অহিংস সত্যাগ্রহের পথ বিপ্লবী ঋষি গান্ধীর চোখে ধরা দিয়েছিল" লিখেছেন ভূপেন্দ্র কুমার। কমিউনিজম বা সাম্যবাদ একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে কিন্তু তা অস্ত্রসজ্জা বন্ধ করতে পারে না। তা কর ল করতে পারে শুধু গান্ধীবাদী সত্যাগ্রহ"—এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন ভূপেন্দ্রকুমার।

"মনুষ্যজগৎও এগিয়ে চলেছে, গান্ধীবাদও এগিয়ে চলেছে বিপ্লব ধর্মও এগিয়ে চলেছে।"

ভূপেন্দ্রকুমার গান্ধীবাদে পূর্ণ আস্থা জানিয়ে স্পষ্টভাষায় বলেছেন যে, পৃথিবীকে বাঁচনোর আর কোন পথ নেই, গান্ধীবাদ ছাড়া। কংগ্রেস নেতাদের কটাক্ষ করে তিনি বলেছেন, "বিপ্লবী চেতনার দেউলে নেতৃত্বের গণআন্দোলনের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। গান্ধী এক পরিত্যক্ত নেতা সেদিন।"

নিহত গান্ধীজী এগিয়ে চলেছেন সীমাহীন পথে "ক্রোধে আমরা তাঁকে হনন করেছি, প্রেমে আমরা তাঁকে এখন গ্রহণ করব।" (বিপ্লবী গান্ধী ও ভারতের বিপ্লবান্দোলন—গান্ধী পরিক্রমা)

এইবার একজন প্রখ্যাত বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবী এবং কেন্দ্রের প্রাক্তন মন্ত্রী হুমায়ুন কবির কি দৃষ্টিতে গান্ধীজীকে বিচার করেছেন তা লক্ষ্য করে এই প্রসঙ্গ শেষ করব।

তিনি লিখেছেন, "ভারতবর্ষের মানুষের কাছে গান্ধীর প্রধান অবদান তাঁর অভয়বাণী।...তাঁর প্রধান কৃতিত্ব যে, যুদ্ধের পরিবর্তে দ্বন্দ্ব সমাধানের অন্য পথের নির্দেশ তিনি দিয়েছিলেন। বুদ্ধির পথে, যুক্তির পথে, দ্বন্দ্ব নিরসনের যে অস্ত্র অহিংস আন্দোলনের মধ্যে গড়ে উঠল, তার জন্য যতদিন মানুষ বাঁচবে, গান্ধীর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে।"

এর পরেই হুমায়ুন কবির লিখেছেন, "গান্ধীজীর জীবনেও ব্যর্থতা ছিল—

মানুষ কোনোদিন অকলঙ্ক হতে পারে না এবং সেই দুর্বলতার গ্লানি বিজয়ের মুহূর্তেও আমাদের আনন্দকে নিষ্প্রভ করে দেয়। গান্ধী পৃথিবীর মানুষকে বুদ্ধির পথে—মুক্তির পথে—গণতন্ত্রের পথে অগ্রসর হতে আহ্বান করলেন, কিন্তু ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সংগ্রামে বহুবার বুদ্ধির পথ ছেড়ে আবেগ ও বিশ্বাসকে বড় করে তুলেছেন। হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান তিনি করতে পারেন নি, বরং সে সমস্যাকে আরো জটিল করে অবশেষে দেশবিভাগের দায়িত্বও অন্তত আংশিকভাবে নিলেন। গান্ধীর জীবনে এই বোধহয় সবচেয়ে বড় পরাজয়।"

"এ পরাজয়ের বীজ গান্ধীজীর নিজের মধ্যেই নিহিত ছিল"—এই মন্তব্য করে হুমায়ুন কবির বলেছেন যে, উত্তাল গণ-আন্দোলনের প্রভাবে "অনেক আবর্জনার সঙ্গে যুক্তিপ্রধান রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীও ভেসে গেল।" ১৯২০ সালের আগে মিঃ জিন্না সাহেবের যত অপরাধই থাক, তার মতন জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিক সেকালে এদেশে খুব কমই ছিলেন।" খেলাফৎ আন্দোলন জোড়াতালি দিয়ে গান্ধীজী যখন রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে ধর্মীয় আন্দোলনকে যুক্ত করলেন তখন জিন্না সাহেব সাবধান করে দিয়েছিলেন গান্ধীজীকে কিন্তু "গান্ধী সেকথা শুনলেন না।"

"রাজনৈতিক স্রোত যতদিন তীব্র ও গতিশীল ততদিন এই সুস্থ ধর্মচেতনার উদ্বোধনে যে বিপদ তা কারু চোখে ধরা পড়ে নি।" চৌরিচৌরার পর আন্দোলন প্রত্যাহারের ফলে দেশে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব স্বাভাবিকভাবেই সৃষ্টি হল তার ফলেই জিন্না সাহেব কংগ্রেস ছাড়লেন এবং স্বধর্মচ্যুত হয়ে আবেগ আন্দোলনের পথে মুসলমানদের মধ্যে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির আলোড়ন সৃষ্টি করলেন"। কংগ্রেস যেদিন তাঁর কাছে প্রায় আত্মসমর্পন করেও পাকিস্তানের দাবি রোধ করতে পারলো না, কারণ লগ্ন তখন পার হয়ে গেছে এই মন্তব্য করে হুমায়ুন কবির লিখেছেন "জিন্না সাহেবও পাকিস্তান সৃষ্টি করে জীবনের চরম পরাজয় মানলেন। পাকিস্তান সৃষ্টি গান্ধীজীর জীবনেও চরম পরাজয়।"

"পরাজয়ের পরমুহূর্তেই কিন্তু গান্ধীজীর প্রতিভা ও ব্যক্তিত্ব আরও দেদীপ্যমান হয়ে উঠল।···ভারত বিভাগের পরে আত্মিক যে সংগ্রামে তিনি নিজেকে ঢেলে দিলেন, পৃথিবীর ইতিহাসে তার বেশী তুলনা মিলবে না।··· মানবতার সেই দুর্দিনে গান্ধীর কণ্ঠে প্রেমের বাণী, অহিংসার বাণী, সহযোগের বাণী মূর্ত্তিমন্ত হয়ে উঠল।" (গান্ধী পরিক্রমা)

এখন রবীন্দ্রনাথের গান্ধীজী সম্পর্কে কয়েকটি মন্তব্যের উল্লেখ করে

বর্তমান আলোচনা শেষ করছি। গান্ধীজীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অনেক বিষয়েই মতভেদ ঘটেছে এবং তিনি তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করতে কখনও কুণ্ঠিত হন নি। তবু তাঁর সঙ্গে গান্ধীজীর মিলন ঘটেছিল গভীরভাবে।

১৯২১ সালের শেষদিকে গান্ধীজীর এক প্রিয় শিষ্যা রবীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, তাঁর ও মহাত্মার মধ্যে পার্থক্য কোথায়? জবাবে রবীন্দ্রনাথ লেখেন: "উপনিষদে বলে সৃষ্টির মূলে আছে তপস্যা ও আনন্দের মধ্যে বিরোধের মিলন এবং মহাত্মাজী হলেন তপস্যার প্রবক্তা আর আমি আনন্দের কবি।"

(দ্রঃ গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ, অম্লান দত্ত
দেশ, ১৭ই আগস্ট, ১৯৮৫)

দুজনেই তপস্যা ও আনন্দের মধ্যে দিয়ে সত্যকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছিলেন, দুজনেই তপস্যা ও আনন্দের বিরোধ ও মিলনের মধ্যে প্রেমকে তুলে ধরেছিলেন।

গান্ধীজী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অভিমত স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেন ১৯৩০ সালে জার্মানীতে। এই সময় সারবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি যে বক্তৃতা দেন তারপর জার্মান নাগরিক প্রশ্ন করেন, "গান্ধী কি তাঁর উদ্দেশ্যগুলি কার্যকর করতে পারবেন?" জবাবে রবীন্দ্রনাথ বলেন, সে কথা কে জানে? কিন্তু আমি যা জানি তা হচ্ছে এই: (১) তিনি এক অঘটন ঘটিয়েছেন, (২) তিনি আমাদের ঐক্যবদ্ধ করেছেন, (৩) তিনি আমাদের মর্যাদা দিয়েছেন এবং (৪) তিনি আমাদের উন্নত করেছেন। (দ্রঃ দেশ ১৫ আগস্ট ১৯৮১)

ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম (এখনও জীবিত) প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এস এ ডাঙ্গে ১৯২১ সালের এপ্রিলে "গান্ধী এ্যাণ্ড লেনিন" নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এতে তিনি গান্ধীজীর আন্দোলনকে বৈপ্লবিক আন্দোলন বলেই স্বীকৃতি দেন এবং ১৯১৯ সালেই তিনি কংগ্রেস আন্দোলনে যোগ দেন। লেনিনের সঙ্গে গান্ধীজীর তুলনা করে তিনি লেনিনকেই সমর্থন করেন তবে কোথাও তিনি গান্ধীজীকে "প্রতিক্রিয়াশীল" বা "সাম্রাজ্যবাদ ও বুর্জোয়াদের দালাল" বলে চিহ্নিত করেন নি।

অন্যদিকে পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য মুজফ্ফর আহমদ মানবেন্দ্রনাথ ও স্তালিনের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়ে (স্তালিন গান্ধীজীকে পাদ্রী

গ্যাপনের সমধর্মী বলে বর্ণনা করেছিলেন) মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা চলাকালে তাঁর বিবৃতিতে বলেন : "মিঃ গান্ধী প্রতিক্রিয়াশীলতার প্রমূর্ত প্রতিভূ। তাঁর চরকা আর খদ্দর কৃষকদের প্রতারণা করার মাধ্যম যদি নাও হয়, অর্থ-নৈতিক বোকামির চিহ্ন। অহিংসার প্রতি তাঁর অন্ধ বিশ্বাস একটি আধ্যাত্মিক অন্তঃসারশূন্য বুলি মাত্র—অপরিণত ভারতীয় বুর্জোয়াদের কাপুরুষতার চিহ্নের প্রতীক।"

(নন্দন, কমরেড মুজফফর আহমদ
স্মরণ সংখ্যা, ১১শ বর্ষ, ১৯৮৩)

এত তীব্র ভাষায় গান্ধীজীর সমালোচনা আর কেউ করেছেন বলে জানা যায় না।

পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন : তত্ত্ব, তথ্য ও তাৎপর্য

সত্যব্রত দত্ত

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার দশম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে গত ২৩শে মার্চ। একই দিনে কেরালা ও জম্মু-কাশ্মীর বিধানসভারও নির্বাচন হয়। কেরালায় বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট ৩৫টি আসন পেয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে এবং সি পি আই (এম) নেতা ই. কে নয়ানারের নেতৃত্বে ঐ রাজ্যে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছে। জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যেও ন্যাশানাল কনফারেন্স ও কংগ্রেস জোট মন্ত্রিসভা গঠন করেছে। পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে বামফ্রন্ট পেয়েছে ২৫১টি আসন, কংগ্রেস ৪০টি! এবারের নির্বাচনে মোট ভোটার সংখ্যা ছিল ৩ কোটি ৫৪ লক্ষ। শতকরা ৭৫ জনের বেশী ভোটার ভোট দিয়েছেন। মোট প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৫৪ ভাগের মতো পেয়েছে বামফ্রন্ট, যা ছিল ১৯৮২তে শতকরা ৫২ এবং ১৯৭৭এ শতকরা ৪৩। ১৯৭৭এ বামফ্রন্ট পেয়েছিল মোট ২৩১টি আসন, ১৯৮২তে ২৩৮ আর এবারে ২৫১। নির্বাচনের বিশদ ফলাফল, জেলা-ওয়ারি বা নির্বাচনী এলাকাভিত্তিক সমীক্ষা এখনও প্রকাশিত হয় নি। সেজন্য এই নিবন্ধ সাধারণভাবে পশ্চিমবঙ্গে বিগত নির্বাচনের পর্যালোচনা এবং এর রাজনৈতিক তাৎপর্য আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির এক গুরুত্বপূর্ণ পটভূমিকায় এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রে রাজীব গান্ধীর নেতৃত্বাধীন সরকারের বিগত দুই বৎসরের অর্থনৈতিক নীতি দেশকে এক আর্থিক সঙ্কটের মুখে ঠেলে দিয়েছে। বিগত কেন্দ্রীয় বাজেটে ঘাটতি দেখানো হয়েছে ৮২৮৫ কোটি টাকা। এই ঘাটতি বেড়ে ১২ হাজার থেকে ১৫ হাজার কোটি টাকায় গিয়ে দাঁড়াতে পারে বলে অর্থনীতিবিদরা মনে করছেন। প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় বাড়ানো হয়েছে শতকরা ৪৩ ভাগ এবং ১৯৮৭-৮৮র বাজেটে তা ১২ হাজার ৫শো ১১ কোটি টাকায় গিয়ে পৌঁছেছে। এই ধরনের ঘাটতি ব্যয় ও প্রতিরক্ষা খরচ

ভারতীয় অর্থনীতিকে এক বিপজ্জনক পর্যায়ে নিয়ে যাবে অনেকে আশঙ্কা করছেন। সুপরিকল্পিতভাবে কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন স্তরে নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার করে নেওয়ার ফলে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে। বেসরকারী ক্ষেত্রকে পুষ্ট করার জন্য কোম্পানী কর, আয়কর ইত্যাদি হ্রাস করা হচ্ছে। বিদেশী দ্রব্য ও প্রযুক্তি আমদানীর উদারনীতি গ্রহণ করার ফলে দেশজ বিভিন্ন শিল্প আজ সংকটের সম্মুখীন। বাণিজ্য ঘাটতিও দিন দিন বেড়ে চলেছে; বাড়ছে বিদেশী ঋণের বোঝা। এক হিসাবে প্রকাশ ভারতের অর্জিত বৈদিশিক মুদ্রার ২৪ শতাংশ চলে যায় বিদেশী ঋণের সুদ দিতে! কল-কারখানা বন্ধ, বেকারের সংখ্যাও দিন দিন বাড়ছে। কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্য দ্রুতহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে; অন্যদিকে চাষীরা ন্যায্য দামে বঞ্চিত হচ্ছে। বিদেশ থেকে সিনথেটিক আমদানি করার ফলে পাটশিল্প এক বিপর্যয়ের মুখে; পাটচাষী আজ সর্বস্বান্ত। এর মধ্যে আবার আধুনিকীকরণের জন্য একচেটিয়া পাট মালিকদের হাতে সরকার ২৫০ কোটি টাকা তুলে দিচ্ছেন! ১৭০০ কোটি টাকা খরচ করে দেশের ৭০ ভাগ মানুষকে দূরদর্শনের আওতায় নিয়ে আসা হচ্ছে, আর খরা, বন্যায় প্রতি বৎসরই অগণিত লোক প্রাণ হারাচ্ছেন। কমপিউটর প্রচলন, প্রযুক্তি আমদানি ইত্যাদির ফলে সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির উপর আমাদের নির্ভরশীলতা বাড়ছে, অর্থনৈতিক স্ব-নির্ভরতা অর্জনের কর্মসূচী আজ পরিত্যক্ত। বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলির সঙ্গে আপোষ করে (আসাম, মিজোরাম চুক্তি, গোর্খাল্যাণ্ড আন্দোলনকে প্রচ্ছন্ন সমর্থন) এবং মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দিয়ে (মুসলিম মহিলা অধিকার রক্ষা আইন, সাম্প্রদায়িক শক্তির সঙ্গে মৈত্রী) কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকার দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা আরো গভীর করে তুলেছে! সব কিছু মিলিয়ে জনজীবন আজ বিপর্যস্ত, রাজনৈতিক সংকট ঘনীভূত।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিও ভারতের পক্ষে জটিল হয়ে উঠছে। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মার্কিন সামরিক তৎপরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাকিস্তানকে আধুনিকতম অস্ত্র সরবরাহ করে ভারতীয় উপমহাদেশের নিরাপত্তা ব্যাহত করার পরিকল্পনা করছে রেগন প্রশাসন। সম্প্রতি মার্কিন সিনেটের নিকট প্রাচ্য ও দক্ষিণ এশিয়া সংক্রান্ত পররাষ্ট্র কমিটির সভায় সিনেট সদস্য গর্ডন হামফ্রি দাবী করেছেন আমেরিকা ভারতবর্ষের উপর এমন চাপ সৃষ্টি করবে

যাতে ভারত তার আণবিক কেন্দ্রগুলি আন্তর্জাতিক পরিদর্শনের জন্য খুলে দেয়। বহুজাতিক সংস্থা মারফৎ ভারতের উপর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টির চেষ্টা করছে মার্কিন প্রশাসন। সাম্রাজ্যবাদী এই তৎপরতার বিরুদ্ধে রাজীব সরকার তেমনভাবে সোচ্চার নয়, জনগণকে এব্যাপারে অবহিত ও সংগঠিত করার কোন কর্মসূচীও সরকারের নেই। বরঞ্চ অনেক সময় মার্কিন প্রশাসনকে তুষ্ট করার জন্য সরকার উন্মুখ বলে মনে হয়। যেমন ১৯৮৫ সালের জুন মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর করার সময় এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাজীব গান্ধী প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে রাষ্ট্রসংঘে ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তৎপরতা দেখায় বলে যে অভিযোগ করা হয় তা মোটেই সত্য নয়। উন্নয়নশীল দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে বারবার বাধা সৃষ্টি করছে, নতুন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বাস্তব রূপায়ণের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে সে ব্যাপারে ভারত নীরব! এককথায় বলা যায়, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মোকাবিলা করার জন্য কোন বলিষ্ঠ কর্মসূচী রাজীব সরকারের নেই, তৃতীয় দুনিয়ার সমস্বার্থীন অনেক দেশেরই যা আছে।

২

নির্বাচনী বিশ্লেষণে যাওয়ার আগে প্রয়োজন হয় নির্বাচন-পূর্ব পরিস্থিতিতে বিভিন্ন সাংবাদিক ও কংগ্রেস নেতারা যেসব "তত্ত্ব" পরিবেশন করেছেন তার কিছুটা আলোচনার। আজকাল সংখ্যাতত্ত্ব দিয়ে জনমতের প্রবণতা বিশ্লেষণ করে নির্বাচনী ফলাফল সম্বন্ধে পূর্বাভাস দিচ্ছেন একশ্রেণীর বিশেষজ্ঞরা। এদের বলা হয় সেফোলজিস্ট। পশ্চিমী দেশগুলিতে যে কাঠামোয় নির্বাচন হয় তাতে হয়ত এই ধরনের পূর্বানুমান চূড়ান্ত ফলের সঙ্গে কিছুটা মিলে যায় কিন্তু ভারতের মতো দেশে এর যথেষ্ট সীমাবদ্ধতা আছে। পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনের আগে এদের বক্তব্য ছিল অনিশ্চিত ভোটারদের (যারা মোট ভোটারের ৬ শতাংশের মতো) উপরেই নির্ভর করবে নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল। ভোট বেশী পড়লে কংগ্রেসের সুবিধা হবে বলে এরা অনুমান করেন। নির্বাচনের পর প্রাথমিক হিসাবে ঘোষণা করা হয় পশ্চিমবঙ্গে শতকরা ৬৫ ভাগ ভোট পড়েছে। এই বিশেষজ্ঞরা তখন বলেন, শতকরা দশভাগ ভোট যদি বেশী পড়ত তবে বামফ্রন্টের এই বিপুল সাফল্য সম্ভব হতো

না। পরবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গে মোট প্রদত্ত ভোটের যে চূড়ান্ত হিসাব বেরিয়েছে তাতে দেখা যায় শতকরা ৭৫ ভাগের বেশী ভোটার নির্বাচনে অংশ নিয়েছেন। এই তথ্য প্রকাশিত হওয়ার পর ঐসব বিশেষজ্ঞরা অবশ্য এখন সম্পূর্ণ নীরব। বামফ্রন্ট জিতলে স্বল্প গরিষ্ঠতা নিয়ে জিতবে, কংগ্রেসের আসন সংখ্যা অনেক বেড়ে যাবে, এই ধরনের পূর্বাভাস প্রকাশিত হচ্ছিল বিভিন্ন সংবাদপত্রে। বামফ্রন্ট প্রার্থীরা নির্বাচনী এলাকার সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন না, ফলে তাদের পরাজয়ের সম্ভাবনা আছে, এ প্রচারও চলে অব্যাহত গতিতে ('পাঁচ বৎসরে একবার', মুখ্যমন্ত্রী সম্বন্ধে এ কথা বলা হয়)। গ্রামে ভয়ভীতির রাজত্ব চলছে, সুতরাং "চিহ্নিত" হয়ে যাওয়ার ভয়ে লোকেরা কংগ্রেসকে ভোট না দিতে পারে, এই ধরনের বক্তব্যও পরিবেশিত হয়। পঞ্চায়েতের দুর্নীতি, স্বজন-পোষণ ইত্যাদি নানা ধরনের বিকৃত প্রচার সংবাদপত্রগুলিতে দিনের পর দিন চলতে থাকে। এর পর স্বয়ং কংগ্রেস সভাপতি প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রচারের দায়িত্ব নেন। কয়েকবার ঝটিকা সফরে ৬৭ ঘণ্টায় তিনি ৫১টি জনসভায় (পথসভা ইত্যাদি নিয়ে ৭৫টি) বক্তৃতা করেন। "হতাশাচ্ছন্ন" পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণকে তিনি আশ্বাস দেন নতুন বাংলা গড়ার। তরুণদের নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠিত হবে এবং নিজে তিনি দিল্লী থেকে মন্ত্রিসভার কাজকর্ম তদারকি করবেন, এ-প্রতিশ্রুতিও জনসাধারণ পায়। ১০ লক্ষ লোকের চাকুরী, দু'টাকা কিলো দরে চাল সরবরাহের প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়। রাজীবের প্রধান অভিযোগ ছিল: পশ্চিমবঙ্গে আইনশৃঙ্খলা নেই, মানুষ ভয়-ভীতি ও সন্ত্রাসের মধ্যে আছে, মুখ খুলে সাহস নিয়ে কথা বলতে পারছে না। কাটার রাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কাজকর্ম হচ্ছে না; কেন্দ্রীয় টাকা ফেরৎ যাচ্ছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। সুতরাং লাল দুর্গে আঘাত হানতে হবে। ১০০৭ কোটি টাকা সাহায্যের কথা ফলাও করে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হতে থাকে, মন্ত্রিসভার বয়স্ক ও প্রবীণ সদস্যদের কর্মক্ষমতা নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করা হয়। 'রাজীব হাওয়া' পশ্চিমবঙ্গকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে —এই বক্তব্য প্রচার করা হয় সংবাদপত্র ও বিভিন্ন গণমাধ্যমে। বামফ্রন্টের বিরাট কর্মকাণ্ডের দিকে নজর না দিয়ে, গ্রামবাংলার রাজনৈতিক পটভূমিতে যে বিরাট পরিবর্তন এসেছে তা উপেক্ষা করে সমষ্টিগত অভিজ্ঞতা থেকে ব্যক্তির চিন্তা-ভাবনাকে বেশী প্রাধান্য দিয়ে বামফ্রন্ট-বিরোধী 'তাত্ত্বিক' ও কংগ্রেস নেতারা প্রচার করতে লাগলেন, নির্বাচনে কংগ্রেসের সাফল্য

অবধারিত। এর উপর রাজীব গান্ধী পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনের সঙ্গে এমনভাবে নিজেকে জড়িত করলেন যে মনে হল, ২১৪টি আসনেই রাজীবই কংগ্রেস প্রার্থী। এমনভাবে পূর্বতন কোন প্রধানমন্ত্রীই রাজ্য নির্বাচনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন নি।

৩

দশম বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের যে প্রাথমিক হিসাব পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় বামফ্রন্ট ৮৫ শতাংশ আসনে জয়ী হয়েছে। কংগ্রেস পেয়েছে ১৪ শতাংশ আসন। প্রদত্ত বৈধ ২ কোটি ৬২ লক্ষ ৬২ হাজার ৬৪৫ ভোটের মধ্যে বামফ্রন্ট পেয়েছে ১ কোটি ৩৯ লক্ষ ৮ হাজার ৫৩১টি ভোট। কংগ্রেস পেয়েছে ১ কোটি ১ লক্ষ ৮৪ হাজার ৬৭৪টি। ১৯৮২র তুলনায় বামফ্রন্ট ও কংগ্রেস উভয়েরই ভোট বেড়েছে প্রায় সমান হারে। গ্রামাঞ্চলে বামফ্রন্টের সমর্থন অনেক বেড়েছে। বামফ্রন্ট মন্ত্রী বিনয় চৌধুরী ৫৭ হাজার, কানাই ভৌমিক ৩০ হাজারের ব্যবধানে কংগ্রেস প্রার্থীদের পরাজিত করেছেন। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য যাদবপুরে ৩৬ হাজারের বেশী ভোটে জয়ী হয়েছেন। ইটাহারে জয়নাল আবেদিন হেরেছেন সি পি আই-এর স্বদেশ চাকীর কাছে। সি পি আই-প্রার্থী সৈয়দ ওয়াহেদ রেজা কান্দি কেন্দ্রে কংগ্রেসকে পরাজিত করেছেন। মালদহের রতুয়া, হরিশ্চন্দ্রপুর, গাজোল, হবিবপুর প্রভৃতি উল্লেখ-যোগ্য কেন্দ্রে সি পি আই (এম) প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন। তফসিলি জাতি ও উপজাতি অধ্যুষিত অনেক কেন্দ্রেই বামফ্রন্ট প্রার্থীরা জয়লাভ করেছেন। সংবাদে প্রকাশ ঝাড়খণ্ড দলের প্রভাবান্বিত বিনপুর, ঝাড়গ্রাম, গোপীবল্লভপুর ও কেশিয়ারী, নয়াগ্রাম ইত্যাদি কেন্দ্রে সি পি আই (এম) প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন। কলকাতায় বামফ্রন্টের চেয়ে কংগ্রেস বেশী ভোট পেয়েছে। "বেলগাছিয়া, কবিতীর্থ, এন্টালী, রাসবিহারী এভেন্যু, আলিপুর, শিয়ালদহ কেন্দ্রে বামপন্থী প্রার্থীরা পরাস্ত হয়েছেন। জেলার ক্ষেত্রে দেখা যায় দার্জিলিং ছাড়া বাকী ১৮টি জেলাতেই ১৯৮২ সালের তুলনায় ১৯৮৭ সালে বামফ্রন্টের ভোট বেড়েছে। কংগ্রেসের ভোট কমেছে দার্জিলিং ও পশ্চিম দিনাজপুর জেলায়। অন্য জেলাগুলিতে কংগ্রেসেরও ভোট বেড়েছে। বামফ্রন্ট ও কংগ্রেসের ভোট বৃদ্ধির হার প্রায় সমান।

(৪)

গ্রামাঞ্চলে বামফ্রন্টের এই সাফল্য মোটেই আকস্মিক বা অপ্রত্যাশিত নয়। বিগত কয়েক বৎসর গ্রাম বাংলায় যে "নীরব বিপ্লব" অনুষ্ঠিত হয়েছে, তা সম্বন্ধে শহরাঞ্চলের মানুষ খুব কমই অবহিত ছিল। সংবাদপত্রে এই আভাস মেলেনি, বরঞ্চ ভূমিসংস্কার ও পঞ্চায়েত ব্যবস্থা সম্বন্ধে নানা কুৎসা রটনা করা হয়েছে। অথচ গত দশ বৎসর বামফ্রন্ট সরকারের গণমুখী বিভিন্ন কর্মযজ্ঞের ফলে গ্রামীণ মানুষ যে আত্মবিশ্বাস ও আত্মসম্মানবোধে উদ্বুদ্ধ হয়েছে তা অভূতপূর্ব। বর্তমান আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা এবং সাংবিধানিক বাধার জন্য কোন রাজ্য সরকারের পক্ষেই মৌলিক পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়। তবুও ভূমিসংস্কার, পঞ্চায়েত ও গ্রামীণ উন্নয়নের বিভিন্ন পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণের মাধ্যমে বামফ্রন্ট সরকার গ্রামীণ মানুষের জীবন ও চিন্তায় এক বিরাট পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছে। এর মধ্যে সরকারের ভূমিসংস্কার কর্মসূচীর সফলতা গ্রামীণ উন্নয়নে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কংগ্রেস আমলেই ১৯৫৩ সালে জমিদারী অধিগ্রহণ আইন ও ১৯৫৪ সালে ভূমিসংস্কার আইন প্রণীত হয়। জমিদারী স্বত্ব বিলোপ, জমির ঊর্ধ্বসীমা নির্ধারণ এবং ভূমিহীনদের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমি বণ্টনের ব্যবস্থা এই দুটি আইনেই ছিল। দীর্ঘ দুই দশকেও কংগ্রেস সরকার এই আইনের প্রয়োগ করেনি। বিগত দশ বৎসরে বামফ্রন্ট সরকার কৃষক সংগঠন ও পঞ্চায়েতের সহযোগিতায় বিদ্যমান এই দুটি আইনের মাধ্যমেই ভূমি ব্যবস্থায় সুনির্দিষ্ট পরিবর্তন নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে। তাছাড়া ১৯৮১ সালের পশ্চিমবঙ্গ ভূমিসংস্কার (সংশোধনী) আইন (যেটি পাঁচ বৎসর পর রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পেয়েছে) বিধিবদ্ধ হওয়ার ফলে আরো বেশী উদ্বৃত্ত জমি সরকারের হস্তগত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। সরকারী ও রাজনৈতিক সংহত প্রচেষ্টার ফলে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে যে বিরাট পরিবর্তন এসেছে, তা কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রকের স্বীকৃতিতেও প্রকাশ পেয়েছে। ঐ মন্ত্রক কর্তৃক সংকলিত হিসাবে দেখা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ১২ লক্ষ একর উদ্বৃত্ত জমি সরকারী নিয়ন্ত্রণে এসেছে এবং তা ৫৬ লক্ষ ভূমিহীন কৃষকের মধ্যে বিলি করা হয়েছে। যাঁরা জমি পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে তফশিলী জাতি ও উপজাতির সংখ্যা শতকরা ৫৭ ভাগ।

বর্গাদারদের অধিকার সুরক্ষিত করা এবং বর্গা জমিতে তাদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেওয়া বামফ্রন্ট সরকারের অন্যতম কর্মকাণ্ড। এ ব্যাপারেও সরকার প্রচলিত আইনের মাধ্যমেই গ্রামীণ মানুষকে প্রতিষ্ঠা দিতে পেরেছে। প্রায় একশো বছর আগে ১৮৮৫ সালে আমাদের দেশে যে আইন পাশ হয়েছিল তাতে বর্গাদারদের নাম সেটেলমেন্টে নথিভুক্ত করার সংস্থান ছিল! বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরই এ ব্যাপারে উদ্যোগ নেয় এবং "অপারেশন বর্গা" নামে এক বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করে। হিসাবে প্রকাশ ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত প্রায় ১০১৯ লক্ষ বর্গা নথিভুক্ত হয়েছে। এর ফলে বর্গাদারদের অধিকার সুরক্ষিত হয়েছে, গ্রামীণ অর্থনীতিতে অস্থিরতা হ্রাস পেয়েছে, এবং কৃষি উৎপাদনও উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। কেন্দ্রীয় প্রতিবেদনে স্বীকার করা হয়েছে যে, ১৯৭৫-৭৬ সালের তুলনায় খাদ্যশস্যের উৎপাদন পশ্চিমবঙ্গে ১৯৮৪-৮৫ সালে সাত লক্ষ টন বেড়েছে।

তাছাড়া গ্রামীণ অর্থনীতিকে সংহত করার জন্য সরকার নানা প্রকল্প হাতে নিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের কৃষি ব্যবস্থায় বড়, মাঝারি এবং ক্ষুদ্র সেচপ্রকল্প প্রায় ৬১ লক্ষ হেকটেয়ার কৃষি জমিতে বিস্তৃত; এর মধ্যে ক্ষুদ্র সেচের অন্তর্ভুক্ত ৩৮ লক্ষ হেকটেয়ার জমি। বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ক্ষুদ্র সেচ প্রবর্তনের ফলে বোরো চাষ ১৪ লক্ষ টনকে ছাড়িয়ে গেছে। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের পুনরুজ্জীবন ও সম্প্রসারণ বামফ্রন্ট সরকারের অন্যতম কৃতিত্ব। যেহেতু এগুলি শ্রমনিবিড় শিল্প, প্রায় ৫ লক্ষের মতো কাজের সৃষ্টি হয়েছে। ক্ষেত মজুরদের মজুরি বৃদ্ধিও হয়েছে ১০ বৎসরের আগের তুলনায় দ্বিগুণ। যেসব ভূমিহীন চাষী ১ থেকে ২ বিঘা জমি পেয়েছে, তাঁরা সরকারের কাছ থেকে এবং ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে স্বল্পমেয়াদী ঋণ এবং কৃষি সরঞ্জামাদি কেনার জন্য ধার পাচ্ছে। বিগত দশ বৎসরে 'কাজের বিনিময়ে খাদ্য' ও 'জাতীয় কর্মসংস্থান কর্মসূচীর' মাধ্যমে প্রায় ২৮ কোটি শ্রম দিবস গ্রামাঞ্চলে সৃষ্টি হয়েছে। গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়েছে; বেড়েছে পড়ুয়ার সংখ্যা। ১৯৭৬-৭৭ ও ১৯৮৪-৮৫ সালের মধ্যে প্রায় ১১ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়েছে আর পড়ুয়ার সংখ্যা ২০ লক্ষের উপর। রাজ্য বাজেটে শিক্ষাখাতে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ১১৪ কোটি টাকা ১৯৭৬-৭৭ সালে, ১৯৮৬-৮৭-র বাজেটে তা বেড়ে হয়েছে ৬৩৯ কোটি অর্থাৎ বাজেটের ২৩ শতাংশ। এখন পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার জন্য মাথাপিছু ব্যয় হচ্ছে ১১৭ টাকা। গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন সরকারী

প্রচেষ্টার সম্মিলিত ফলশ্রুতি ও কৃষক সংগঠনগুলির ভূমিকা গ্রামীণ লোকের ব্যবহারিক ও চিন্তার জগতে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন নিয়ে আসতে অক্ষম হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে জোতদার ও ধনী কৃষকের প্রভাব ক্ষুণ্ণ হয়েছে, অধিকারবোধ চেতনায় গ্রামীণ চাষী উদ্বুদ্ধ হয়েছে, ভূমি সংস্কারের ফলে অনেকাংশে মধ্যস্বত্ব বিলোপ সম্ভবপর হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বামফ্রন্টের সমর্থন বৃদ্ধি মোটেই অস্বাভাবিক বা অপ্রত্যাশিত নয়। বরঞ্চ আশা করা যায় যে অধিকার বোধ ও রাজনৈতিক ক্ষমতার আস্বাদ গ্রামীণ মানুষ পেয়েছে, তা থেকে কোন মতেই তাঁদের বঞ্চিত করা যাবে না। বৃহত্তর রাজনৈতিক লক্ষ্যে এর গুরুত্ব মোটেই উপেক্ষনীয় নয়।

পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সাফল্যও গ্রামের মানুষের মানসিকতায় বিরাট পরিবর্তনএনে দিয়েছে। গান্ধীজী থেকে শুরু করে ছোট-বড় সব কংগ্রেস নেতাই পঞ্চায়েত ব্যবস্থার গুরুত্ব স্বীকার করেছেন। ভারতীয় সংবিধানেও পঞ্চায়েতের ভূমিকার উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু একমাত্র পঞ্চায়েত আইন প্রণয়ন (১৯৭৩) ছাড়া এ ব্যাপারে কংগ্রেস সরকারকে বিশেষ সক্রিয় হতে দেখা যায় নি। ক্ষমতায় আসার পরই বামফ্রন্ট সরকার পঞ্চায়েত নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন। প্রথম নির্বাচন হয় ১৯৭৮ সালে, আর পরবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৩ সালে। প্রথম নির্বাচনেই গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ এই ত্রি-স্তরে মোট ৫৬ হাজার প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। যাঁরা নির্বাচিত হন, তাঁদের অধিকাংশই নিম্নবিত্ত ও স্বল্পবিত্ত শ্রেণীর লোক। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করে পঞ্চায়েতগুলিকে বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণের কাজে যথেষ্ট শক্তিশালী করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসমষ্টির শতকরা ৮০ ভাগ লোক গ্রামে বাস করেন। দরিদ্র গ্রামবাসী তাঁদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে পঞ্চায়েতের ভূমিকা লক্ষ্য করেছে, ভুলত্রুটির কৈফিয়ৎ চেয়েছে এবং পঞ্চায়েত প্রতিনিধি তাঁর খুব কাছের লোক, এ কথা উপলব্ধি করেছে।

বিভিন্ন পঞ্চায়েতের কাজকর্মে ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়েছে, এদের বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ থাকাও অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু দীর্ঘদিনের স্থবিরত্ব ও জড়তা কাটিয়ে পঞ্চায়েত গ্রামকে কর্মমুখর করেছে এবং বিভিন্ন কাজকর্মের সঙ্গে গ্রামের সাধারণ মানুষকে যুক্ত করেছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৫৯ শতাংশ লোক দারিদ্র্যসীমার

নীচে ছিলেন। ১৯৮৩-৮৪ সালের জাতীয় স্যাম্পল সার্ভের রিপোর্টে দেখা যায়, পশ্চিমবঙ্গে গ্রামে দারিদ্র্যসীমার নীচে থাকা মানুষের সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ৩৩·৮ শতাংশ। এ সাফল্যের কৃতিত্ব যাদের, গ্রাম এলাকার মানুষ তাদের সমর্থন জানাবে, এটাই স্বাভাবিক।

বাম ও গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক শক্তির নিরলস প্রচেষ্টা ও সাংগঠনিক শক্তি এবং বামফ্রন্ট সরকারের তৎপরতা বিগত নির্বাচনে বামফ্রন্টের সাফল্য নিয়ে এসেছে। নির্বাচন এক প্রবাহ মাত্র, এর বিশেষ তাৎপর্য নেই, এই তত্ত্ব যারা প্রচার করত তারা অন্তত নতুন করে ভাবতে শিখবেন, এটা আশা করা যায়। বস্তুতঃ সারা ভারতে বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিকে সংহত করার ব্যাপারে কেরালা ও পশ্চিমবঙ্গের বিগত নির্বাচনের গুরুত্ব অপরিসীম। কেরালা ও পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনের এই সাফল্য ও স্থিতিশীল সরকার গঠন সারা ভারতের সামনে আজ বাম গণতান্ত্রিক বিকল্পের সম্ভাবনাকে আরও বাস্তব করে তুলেছে।

কিন্তু এই নির্বাচনের দুর্বলতম দিকগুলির সম্বন্ধে আমাদের সচেতন হতে হবে। সম্প্রতি কিছু কিছু সমীক্ষাও এ বিষয়ে প্রকাশিত হয়েছে। বামপন্থী দলগুলি নির্বাচন সম্বন্ধে পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করছেন।

প্রথমেই বলতে হয় এই নির্বাচনে শ্রমিকশ্রেণীর মনোভাব যেভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, তা মোটেই আশাব্যাঞ্জক নয়। নৈহাটি, ভাটপাড়া, টিটাগড়, হাওড়া, কুলটি, আসানসোল, হিরাপুর ইত্যাদি শ্রমিক অধ্যুষিত কয়েকটি শিল্পাঞ্চলে বামফ্রন্ট প্রার্থীরা পরাজিত হয়েছেন। যাঁরা পরাজিত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের সঙ্গে দীর্ঘ দিন ধরে জড়িত কয়েকজন প্রথম সারির কমিউনিস্ট নেতা আছেন। বামপন্থী শ্রমিক সংগঠনগুলি এইসব অঞ্চলে শ্রমিকদের দাবি-দাওয়া নিয়ে দীর্ঘ বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম করেছেন। এসব সত্ত্বেও বিড়লাপুর, গার্ডেনরীচ, নৈহাটি, হাওড়া ও আসানসোল শিল্পাঞ্চলে শ্রমিকরা যখন বামপন্থাকে সমর্থন করতে পরাঙ্মুখ হন তখন নিশ্চয়ই তা আশঙ্কার কারণ হয়ে দেখা দেয়। অবশ্য সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় (গণশক্তি, ৭ই এপ্রিল ১৯৮৭) পশ্চিমবঙ্গে প্রধান শিল্পাঞ্চলে অবস্থিত ৩৯টি বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটের ফলাফল বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে যে, শিল্পাঞ্চলে বামফ্রন্টের সমর্থন অব্যাহত আছে। এই ৩৯টি আসনের মধ্যে ২৫টি পেয়েছে বামফ্রন্ট, ১৪টি কংগ্রেস। আর প্রদত্ত ভোটের ৫০·৭৬ শতাংশ পেয়েছে বামফ্রন্ট, কংগ্রেস [illegible]

বামফ্রন্ট মোট ভোট পেয়েছে ১৮ লক্ষ ৮১ হাজার ৪৭৫ আর কংগ্রেস পেয়েছে ১৭ লক্ষ ৪ হাজার ৭৫৫। ১৯৮২-র বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্টের পক্ষে ভোট পড়ে ১৬ লক্ষ ৩৯ হাজার ২২৬ এবং কংগ্রেসের পক্ষে ১১ লক্ষ ৮৭ হাজার ১৯০। ঐ হিসাব অনুযায়ী ১৯৮২ সালে বামফ্রন্ট পায় প্রদত্ত ভোটের ৫৪·৭০ শতাংশ। এবারে পেয়েছে ৫০·৭৬ শতাংশ। বামফ্রন্টের সমর্থন যে শিল্পাঞ্চলে বেশ কিছু হ্রাস পেয়েছে তা বিভিন্ন তথ্য থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। বাঙালী-অবাঙালী প্রশ্ন তুলে এই বিষয়টি আরো জটিল ও একপেশে করে তোলা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিকশ্রেণীর একটি বড় অংশ অবাঙালী। সরকারী পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় চটকল নিযুক্ত বাইরে থেকে আসা শ্রমিকের সংখ্যা হল মোট শ্রমিকের ৬৯·১২ শতাংশ, ইঞ্জিনিয়ারিং এ ৪২·৬ শতাংশ সুতীবস্ত্রে ৫৫·৫০ শতাংশ, লৌহ ও ইস্পাত শিল্প ৫১·২১ শতাংশ। সমস্ত শিল্পে বাইরের শ্রমিকের সংখ্যা হল ৫৩.১৮ শতাংশ। ঐ সূত্রেই প্রকাশ রাজ্যের শ্রমবাহিনীতে বাইরে থেকে আসা শ্রমিকের ভাগ ছিল ১৯৭৯ সালে ৫৮·৫৫ শতাংশ, ১৯৮০তে ৫৮·১৭ শতাংশ ১৯৮১তে ৫৭·৪৭ শতাংশ, আর ১৯৮২তে ৫৩·১৮ শতাংশ। যারা বাইরে থেকে আসছেন স্বভাবতই দেশজ ধারা, অনুভূতি ও রাজনৈতিক প্রবণতা এদের ব্যবহারিক জীবন ও চিন্তাধারায় প্রতিফলিত হবে এটা স্বাভাবিক! বামপন্থীরা শ্রমিকদের সংগঠিত করেছেন ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীকে নিজস্ব শ্রেণীচেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে তারা কোন সময়েই তেমনভাবে সফল হন নি। তা ছাড়া প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা ও শিল্পপতিদের অত্যধিক শোষণ-প্রবণতা শিল্প শ্রমিকদের সামনে ও ট্রেড ইউনিয়নের ক্ষেত্রে নতুন নতুন সমস্যা নিয়ে আসছে। শ্রমিকের রাজনৈতিক চেতনা প্রসারের যেমন প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন তার ব্যবহারিক জীবন, চিন্তা ও মানসিকতায় পরিবর্তন ঘটানো। পশ্চিমবঙ্গের চটকল, কয়লাখনি ও বস্ত্রশিল্প ইত্যাদির অধিকাংশ শ্রমিকের জীবনযাত্রা সেকেলে গোঁড়ামির মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে আছে। ধর্মীয় প্রভাব, কুসংস্কার তাদের আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ন্যূনতম শিক্ষার একান্ত অভাব এদের মধ্যে। জুয়া ও মাদকদ্রব্য সেবনের মধ্যে এদের অধিকাংশের মজুরি নিঃশেষিত হয়। সেজন্যই গোঁড়ামি থেকে মুক্ত করে শ্রমিকশ্রেণীকে নিজস্ব শ্রেণী-রাজনীতিতে উদ্বুদ্ধ করা বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদের আজ বিশেষ দায়িত্ব। নতুন পরিসরে বৃহত্তর রাজনৈতিক আন্দোলনের পরিবেশের সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীকে যুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা বর্তমানে আরো

বেশী। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের দু'টি আসনেই বাম-পন্থী প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন।

শহর কলকাতার ভোট প্রবণতাও বামফ্রন্টের আশাপ্রদ নয়। যাদবপুর ও বেহালার দু'টি নির্বাচনী এলাকা ছাড়া কলকাতায় ২২টি আসনের মধ্যে ১৯৭৭ এ বামফ্রন্ট পেয়েছিল ১৭, ১৯৮২তে ১১ আর ১৯৮৭তে ৯টি আসন। বামফ্রন্টের ভোট ছিল যথাক্রমে ৪০'৯, ৪৯'৬ ও ৪৬'১ শতাংশ। কংগ্রেসের ভোট ছিল ২৯'৭ শতাংশ (১৯৭৭), ৪৫'৩ শতাংশ (১৯৮২) ও ৫০'৫ শতাংশ (১৯৮৭)। এবারে কংগ্রেস কলকাতায় পেয়েছে ১৩টি আসন। আরো লক্ষণীয় যে কাশীপুর ও জোড়াবাগান ছাড়া প্রতিটি আসনে ১৯৮২র চেয়ে বামফ্রন্টের ভোটের হার কমেছে! প্রতিকূল অবস্থা ও নানা সমস্যায় জর্জরিত শহর কলকাতার মধ্যবিত্ত মানসিকতা সরকারকেই সব কিছু অনর্থের মূল বলে দোষারোপ করে। স্বভাবতই যখন যে দল বা মোর্চা ক্ষমতায় থাকে তার প্রতি একটা বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি হয়। অবশ্য এই ধরনের ব্যাখ্যার মধ্যে যে অতিসরলীকরণের ঝোঁক আছে তা অস্বীকার করা যায় না। বহিরাগতরা কলকাতার জনসংখ্যার এক বৃহদাংশ। স্থানীয় রাজনীতির সঙ্গে এদের যোগ-সূত্র খুবই কম। ভোটদাতাদের মধ্যেও বহিরাগতদের সংখ্যা এক-তৃতীয়াংশের বেশী। নিজ নিজ স্থায়ী আবাসস্থলের পরিবেশ এখানে এদের রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনা, আচার-আচরণে প্রতিফলিত হয় এবং সেজন্যই বামপন্থী রাজ-নীতি এদের আকৃষ্ট করে না। তাছাড়া বিহার, উড়িষ্যা ও উত্তরপ্রদেশ থেকে অসংখ্য শ্রমজীবী সাধারণ মানুষ কলকাতায় আসেন জীবিকা অর্জনের জন্য এবং অতিকষ্টে কালাতিপাত করেন। এদের অনেকে (যেমন কলকাতায় ব্যবসা করেন অনেক গোয়ালা সম্প্রদায়ের লোক) নিজ নিজ দেশে প্রায় ছোটখাট কুলাক, শোষক। দেশে এদের যে সামাজিক স্থিতি তাতে এঁদের ভোট বাম-ফ্রন্টের পক্ষে না আসাই স্বাভাবিক। বামফ্রন্ট আমলে শিক্ষার পরিবেশ অনেক সুস্থ ও স্বাভাবিক হয়েছে সন্দেহ নেই কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনাবলী উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তের সামান্য হলেও একটা অংশকে যে প্রভাবান্বিত করেছে তা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। সংবাদপত্র ও টেলিভিশনের বিরুদ্ধ প্রচারও মধ্যবিত্ত মানসিকতায় কিছুটা প্রভাব বিস্তার করেছে। মৌল-বাদী চিন্তা-ভাবনার প্রসার, বাবরী মসজিদের ঘটনাবলীর ফলে কলকাতার উর্দুভাষী জনগণের একটা বড় অংশের ভোটের মধ্যে বামফ্রন্ট বিরোধী মনোভাব

প্রতিফলিত হয়েছে। অন্ততঃ কবিতীর্থ ও এন্টালী এই দুটি কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থীদের জয়লাভ তা নির্দেশ করে।

ইদানীংকালে সারা ভারতে মৌলবাদী চিন্তাধারা মারাত্মকভাবে দেখা দিয়েছে। অর্থনৈতিক সংকট সংখ্যালঘু সাম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে। নানা কারণে তাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবোধ আরো প্রবল হয়ে উঠছে। পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক আবহাওয়া অনুকূল হওয়া সত্ত্বেও মৌলবাদের প্রসার যে এ রাজ্যে হচ্ছে তা অস্বীকার করা যায় না। মুসলিম মহিলা অধিকার রক্ষা আইন এবং বিভিন্ন জায়গায় মৌলবাদের সঙ্গে কংগ্রেসের সমঝোতা এই প্রবণতা আরো বাড়িয়ে তুলছে। চব্বিশ পরগণার দেগঙ্গা কেন্দ্রে ১৬ বৎসর পর মুসলিম লীগ প্রার্থী বিজয়ী হয়েছেন। মালদহ জেলার বিভিন্ন কেন্দ্রে মুসলিম লীগ প্রার্থীরা প্রায় ৪০ হাজারের মতো ভোট পেয়েছেন। মুসলিম লীগের প্রার্থীরা প্রতি কেন্দ্রেই গড়ে প্রায় ৫ হাজার মতো ভোট পেয়েছেন যা পশ্চিমবঙ্গে প্রণব মুখার্জির দলের ভোটের চেয়ে বেশী। অন্যদিকে বিশ্ব হিন্দু পরিষদও সমভাবে সক্রিয়। এক হিসাবে প্রকাশ, মালদহ জেলাতেই ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থীরা ভোট পেয়েছেন ২১ হাজার ৩৮১।

কংগ্রেসের শক্তি খুব একটা হ্রাস পেয়েছে তা মনে করার কোন কারণ নেই। ১৯৮২ সালে কংগ্রেস (আই) ও কংগ্রেস (স) দলের মিলিত ভোট ছিল ৮৭ লক্ষ ৫৮ হাজার ৫৭১, এবারে কংগ্রেস পেয়েছে ১ কোটি ৯ লক্ষ ৮৪ হাজার ৬৭৪ ভোট। এই হিসাবে বলা যায় ১৯৮২ সালের তুলনায় ১৯৮৭ সালে কংগ্রেসের ভোট বেড়েছে ২২ লক্ষ ২৬ হাজার ১০৩টি। বামফ্রন্টের ভোট বেড়েছে ২০ লক্ষ ৮৯ হাজার ৯৬০। অর্থাৎ দুই পক্ষেরই ভোট প্রায় সমানভাবে বেড়েছে। এটা মনে রাখতে হবে ১৯৮২-র চেয়ে এবার অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে কংগ্রেসকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়েছে। প্রথমত কেন্দ্রে কংগ্রেসের এমন এক নেতৃত্ব যার সঙ্গে জাতীয় ভাবধারার, এমনকি কংগ্রেসী ভাবাদর্শের যোগসূত্র খুব ক্ষীণ। এই নেতৃত্বের না আছে কোন চমক, না আছে সর্বভারতীয় ভাবমূর্তি। সংগঠন বলতেও কংগ্রেসের কিছু নেই ; গত ১৫ বৎসর এ রাজ্যে কংগ্রেসের কোন সাংগঠনিক নির্বাচন হয় নি। অন্তর্দ্বন্দ্বে কংগ্রেস বিভক্ত। সর্বোপরি কংগ্রেস প্রার্থীদের অনেকেই ছিলেন বিতর্কিত। এই পরিস্থিতিতে কংগ্রেস যা ভোট পেয়েছে তাতে মনে হয় সামাজিক শক্তি হিসেবে কংগ্রেস এ রাজ্যে যথেষ্ট ক্ষমতাশালী।

বামফ্রন্ট অবশ্য এ ব্যাপারে সচেতন। বামফ্রন্ট নেতৃবৃন্দ নির্বাচনের আগে ও পরে এ ব্যাপারে কোন আত্মতুষ্টির অবকাশ নেই বলে বারবার ঘোষণা করেছেন। বামপন্থী আন্দোলনের প্রয়োজন এই নির্বাচনের ইতিবাচক দিক-গুলি বিশ্লেষণ করে কার্যতঃ অ-বাম কিন্তু মূলত বামবিরোধী নয় এই শক্তিকে বামপন্থার দিকে নিয়ে এসে বাম ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে সংহত ও শক্তি-শালী করা। এটা আজ প্রমাণিত যে বামফ্রন্ট সরকারের বিগত দশ বৎসরের কার্যকলাপ গ্রাম বাংলার প্রতিক্রিয়ার শক্তিকে এক বিরাট আঘাত দিয়েছে. বস্তুতঃ ঐ শক্তিকে অনেকাংশে ভোঁতা করে দিতে সক্ষম হয়েছে। প্রধান মানুষের অভ্যুদয়ের মধ্যেই এই অভিব্যক্তি প্রকাশ পায়। সর্বভারতীয় চিত্রের দিকে একটু নজর দিলে দেখা যায় অল্প রাজ্যে ভূমিসংস্কার কার্যতঃ কিছুই হয়নি, কৃষিক্ষেত্রে জমির মালিকানা মুষ্টিমেয় লোকের কাছে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। দশ একরের বেশী জমি যাদের আছে ভূমি ব্যবস্থায় তারা নিঃসন্দেহে এক বিরাট শক্তি। পাঞ্জাব, রাজস্থান, গুজরাট ও হরিয়ানায় ১০ একরের বেশী জমি হস্ত আছে যথাক্রমে ৪২·২০, ·০·৬, ২২·৩৬ এবং ২৭·৮০ শতাংশের হাতে। মোট জমির তুলনায় এই শ্রেণীর হাতে কেন্দ্রীভূত আছে যথাক্রমে ৬৯·৪০, ৭২·, ৬৬·৪৬ এবং ৬২·২০ শতাংশ জমি। পশ্চিমবাংলা ও কেরালায় বিপরীত চিত্র দেখা যায়। পশ্চিমবঙ্গ ও কেরালায় দশ একরের বেশী জমি হস্ত আছে যথাক্রমে ১·৯ ও ০·. শতাংশের হাতে এবং এদের হাতে জমির অংশ মোট জমির তুলনায় ১৪·৪ ও ১৬·২ শতাংশ মাত্র (মার্কসবাদী পথ, ফেব্রুয়ারী ১৯৮৭, বিনয় চৌধুরীর প্রবন্ধ)। সুতরাং গ্রামীণ পরিবেশে জোতদাররা আজ কোণঠাসা। এটা বিগত দশ বৎসরের গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক দিক।

সারা ভারতের তুলনায় মৌলবাদ ও পশ্চিমবঙ্গ অনেকটা স্তিমিত। নতুন ভাবে মুসলিম লীগের অভ্যুদয় আশঙ্কাজনক নিশ্চয়ই কিন্তু বাঙালী মুসলমানরা আজ মোটামুটিভাবে বামফ্রন্টের দিকে। মালদহ জেলা ও পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম অধ্যুষিত বিভিন্ন কেন্দ্রের নির্বাচনী ফলাফল বিশ্লেষণ করলেই তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি বামফ্রন্ট আগলে আরো শক্তিশালী হবে স্বাভাবিক ভাবেই তা আশা করা যায়। শ্রমিকশ্রেণীই সামাজিক পরিবর্তনের মূল আধার। এই কথা মনে রেখে শ্রমিকশ্রেণীকে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে যে নতুন নতুন সমস্যা দেখা দিচ্ছে তার প্রবণতা লক্ষ্য করে টেড ইউনিয়ন কর্মীদের শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। বিস্তৃত রাজনৈতিক

পরিসরে শ্রমিক আন্দোলনকে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন আজ সর্বাধিক। অভিজ্ঞতায় দেখা যায় ভারতের শাসকশ্রেণী বিভিন্ন সময় চরম সংকটের সম্মুখীন হয়েছে কিন্তু সঙ্কট কাটিয়ে উঠার শক্তিও তারা রাখে। ভারতের জটিল সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা তাদের সঙ্কট উত্তরণে সাহায্য করে। সংসদীয় রাজনীতির মধ্যে পুরোপুরি আবদ্ধ না রেখে, সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক পরিবর্তনের মূল প্রবণতার যথাযথ মূল্যায়ন করে, শ্রমজীবী মানুষ, কৃষক ও বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্তের বিরাট অংশকে সংগঠিত করার মধ্যেই বাম-ফ্রন্টের সাফল্য নির্ভর করবে। বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির দায়িত্ব সেজন্য আজ অনেক বেশী।

বিচ্ছিন্নতাবাদের সমস্যা

নরহরি কবিরাজ

ভারতের রাজনীতিতে আজকের দিনের অন্যতম প্রধান সমস্যা—বিচ্ছিন্নতাবাদের সমস্যা। ভারতের যেদিকেই তাকানো যাক, এই সমস্যা চোখে পড়বে—উদাহরণ হিসাবে প্রথম পাঞ্জাবের কথা ধরা যাক। একথা সুবিদিত যে খালিস্তানী আন্দোলন বিচ্ছিন্নতাবাদের চরম রূপ পরিগ্রহ করেছে। এই আন্দোলন নিকৃষ্ট ধরনের সন্ত্রাসবাদের আশ্রয় নিয়েছে। শুধু তাই নয়, এর জাতীয়তাবিরোধী চরিত্রটি দেশবাসীর বিশেষ উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ত্রিপুরি উপজাতি সম্প্রদায়ের একাংশের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ পূর্ব-ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করেছে। দার্জিলিং, কার্সিয়াং, কালিম্পং প্রভৃতি অঞ্চলে গোর্খাদের একাংশের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বিশেষ উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের আকারে সাঁওতালদের একাংশের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদ মাথা-চাড়া দিয়ে উঠেছে। বস্তুতঃ পার্বত্য উপজাতীয় অঞ্চলগুলিতে বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী সম্প্রদায় নানা ধরনের বিভেদকামী আন্দোলনে সামিল হয়েছে।

ভাষা সমস্যাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ভাষাভাষী প্রতিবেশীদের মধ্যে তীব্র মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। এখানে গোয়ায় মারাঠি ও কোঙ্কনী ভাষাভাষী-দের মধ্যে সম্প্রতি যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে তার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। মাদ্রাজে হিন্দীবিরোধী অভিযান ঐ অঞ্চলে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলিকে উৎসাহ যোগাচ্ছে।

প্রশ্ন উঠতে পারে—স্বাধীনতা প্রাপ্তির চল্লিশ বছর পরে জাতিসমস্যা কেন একটি বিস্ফোরণের আকারে ফেটে পড়ছে।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পূর্বে ছোট-বড় সমস্ত জাতি-উপজাতি নিজেদের মধ্যে বিভিন্নতা ভুলে গিয়ে সকলে একযোগে স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্রগঠনের দাবীতে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। তখন অধিকতর উন্নত ও বিকাশ-

প্রাপ্ত জাতিগুলির নেতৃত্বে (হিন্দীভাষী, মারাঠিভাষী, বাংলাভাষী, পাঞ্জাবীভাষী জনগোষ্ঠীর কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে) অপেক্ষাকৃত অনুন্নত ও কম বিকাশপ্রাপ্ত জাতি উপজাতিগুলিও একযোগে সমশত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করা প্রয়োজন মনে করেছিল। তারা আশা করেছিল—স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরে অনুন্নত ও কম বিকাশপ্রাপ্ত জাতি-উপজাতিগুলির আকাঙ্ক্ষা পূরণ হবে এবং বৃহৎ জাতিগুলির সঙ্গে তারা সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরে পঁচিশ বছর অপেক্ষা করেও তারা যখন দেখল তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের কোনো সুযোগ মিলছে না তখন তারা মরীয়া হয়ে আত্মস্ফুরণের দাবীতে নানা ধরনের আন্দোলন সংগঠিত করতে আরম্ভ করল।

প্রশ্ন উঠতে পারে এই আন্দোলন অনেক ক্ষেত্রেই বিচ্ছিন্নতাবাদের আকার ধারণ করল কেন ?

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পঁচিশ বছর পরেও যেহেতু নীতিনিষ্ঠ ভিত্তিতে জাতি-সমস্যার বা ভাষাসমস্যার সমাধানের কোনো চেষ্টা হয়নি তাই এই সমস্যা হঠাৎ একটি বিস্ফোরণের আকারে ফেটে পড়েছে এবং দেশের গায়ে বিষ-ফোঁড়ার মতো এখানে ওখানে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন গজিয়ে উঠেছে।

আরও মনে রাখা প্রয়োজন, শ্রমজীবী জনগণের উদ্যোগে, শ্রমজীবী জনগণের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এই আন্দোলন গড়ে না ওঠায় অপেক্ষাকৃত অনুন্নত জাতি-উপজাতিগুলির অন্তর্ভুক্ত উপরতলার লোকেরা অনেক ক্ষেত্রে এই আন্দোলনে নেতৃত্ব নিতে এগিয়ে আসার সুযোগ গ্রহণ করেছে। আরও স্পষ্ট করে বললে দাঁড়ায়—এই অপেক্ষাকৃত অনুন্নত জাতি-উপজাতিগুলির অন্তর্ভুক্ত বুর্জোয়া, পেটিবুর্জোয়া, বুর্জোয়া ভাবাপন্ন বুদ্ধিজীবী, অপেক্ষাকৃত ধনী কৃষক প্রভৃতি—যাদের মধ্যে রয়েছে কন্ট্রাক্টার, অল্পশিক্ষিত বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ী, ধনীকৃষক প্রভৃতি—তারাই তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী এই আন্দোলনে গড়ে তুলতে এগিয়ে এসেছে। নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থের দ্বারা পরিচালিত হয়ে তারা নিজেদের জাতীয় (বুর্জোয়া) স্বার্থকে ভিন্ন জাতীয় (বুর্জোয়া) স্বার্থের বিরুদ্ধে দাঁড় করাবার প্রবণতা দেখিয়েছে, ফলে বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছে।

এই বিচ্ছিন্নতাবাদ নানারূপে, নানা আকারে আত্মপ্রকাশ করেছে। প্রথম

পার্বত্যজাতির জনসমষ্টির কথা ধরা যাক। এরা বিপুল সংখ্যায় বাস করে হিমালয় সংলগ্ন পূর্ব ভারতের অঞ্চলগুলিতে (যেমন নাগাল্যাণ্ড, অরুণাচল প্রদেশ, মিজোরাম, ত্রিপুরা কার্শিয়াং, কালিম্পং, দার্জিলিং প্রভৃতি)। উত্তর-পশ্চিম ভারতে হিমালয় সংলগ্ন অঞ্চলগুলিতে নানা ধরনের পার্বত্য জাতীয় লোকেরা বসবাস করে। ভারতের মধ্যভাগে বিহারের অন্তর্গত রাঁচী, মানভূম, সিংভূম প্রভৃতি অঞ্চলে সাঁওতাল, কোল, ওরাঁও প্রভৃতি জাতি-উপজাতি-গুলি বিপুল সংখ্যায় বসবাস করে। স্বাধীনতার পরে চল্লিশ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে কিন্তু এই জাতি-উপজাতিগুলি কোন দিক থেকেই আত্মস্ফুরণের সুযোগ পায় নি। জাতিগত মর্যাদার দিক থেকে, যেমন ভাষা, সংস্কৃতি, কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিজস্ব রাষ্ট্রগঠনের অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত রয়েছে। জীবিকার দিক থেকেও তারা ভারতের শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে সব চেয়ে নির্যাতিত ও নিপীড়িত অংশ। কাজেই আত্মস্ফুরণের দাবীতে আন্দোলন করার ন্যায্য অধিকার এদের আছে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই স্বার্থান্বেষীরা এই ন্যায্য দাবীদাওয়ার সুযোগ নিয়ে এদের সংকীর্ণ জাতীয়তা-বাদের পথে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। এখানে উদাহরণ হিসাবে বিহারের ঝাড়খণ্ড আন্দোলন, ত্রিপুরায় পার্বত্যজাতীয় সন্ত্রাসবাদীদের আন্দোলন, দার্জিলিং, কার্শিয়াং, কালিম্পং-এ ঘিসিং এর নেতৃত্বে গোর্খাদের আন্দোলন প্রভৃতির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতাবাদের শক্তিগুলি দেশের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ করছে। এখানে উদাহরণ হিসাবে অন্ধ্র ও আসামের কথা ধরা যেতে পারে, কি অন্ধ্র কি আসামে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের অধিকার স্বীকৃত লাভ করেছে, কিন্তু ভারতের এই দুটি প্রদেশই অর্থনৈতিক বিকাশের দিক থেকে বিচার করলে একান্ত অনগ্রসর। উভয় অঞ্চলই প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর, কিন্তু তাদের ঐ সম্পদ ভিন্ন-জাতীয় বুর্জোয়া-গোষ্ঠী শোষণ করে চলেছে। ফলে স্থানীয় যুবকেরা হাজারে হাজারে বেকার। তাদের সামনে উন্নতির দরজা বন্ধ। এইসব অঞ্চলে শ্রমজীবী কৃষকেরাও প্রচণ্ড নির্যাতনের স্বীকার হয়ে রয়েছে। কাজেই এই অঞ্চলের লোকদের অসন্তোষের ন্যায্য কারণ রয়েছে, কিন্তু সমাজের উপরতলার কিছু নেতা নিজেদের স্বার্থ অনুযায়ী এইসব অঞ্চলে আন্দোলন গড়ে তুলছে। ফলে এইসব অঞ্চলে জাতিগত দাবীগুলি উত্থাপিত হচ্ছে সমাজের উপর-

তলার লোকদের দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে। লক্ষ্যণীয় যে এই আন্দোলনগুলিতে কৃষকের মধ্যে জমি বন্টনের প্রশ্ন, শ্রমিকের ন্যায্য মজুরির প্রশ্ন একেবারেই উপেক্ষিত। প্রতিবেশী জাতিগুলির বিরুদ্ধে ক্ষোভ এই আন্দোলনগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য, ফলে আসামী, বাঙালী, অন্ধ্র, তামিল প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর মধ্যে মনকষাকষি এমন কি অনেক সময় মার-দাঙ্গা (আসামের ক্ষেত্রে) প্রভৃতিও দেখা দিয়েছে।

পাঞ্জাবের সমস্যাটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। এখানে জাতিগত অধিকারের প্রশ্নটি অছিলা মাত্র। শিখদের নিজস্ব রাষ্ট্র গঠনের (খালিস্তান) অধিকারের দাবী উত্থাপন করে শিখ সম্প্রদায়ের সর্বাপেক্ষা প্রতিক্রিয়াশীল অংশ—যাদের মধ্যে রয়েছে হঠাৎ ফেঁপে-ওঠা কুলাক, কনট্রাক্টর ও ধনী বুর্জোয়া—তারা ধর্মান্ধতাকে মূলধন করে এক চরম বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন গড়ে তুলতে অগ্রসর হয়েছে। প্রস্তাবিত খালিস্তান রাষ্ট্র শিখ সম্প্রদায়ভুক্ত শোষক-শ্রেণীর স্বার্থকে সুরক্ষিত করবে। এতে শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থের লেশমাত্র নেই। খালিস্তানী আন্দোলনের নেতারা ভারত থেকে বেরিয়ে গিয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের মত পুষ্ট একটি আলাদা রাষ্ট্র গঠন করতে চায়। আকালি দলের প্রতিক্রিয়াশীল নেতারা এই আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষক। এই কাজে তারা বিভ্রান্ত শিখ যুবগোষ্ঠীর এবং অবসরপ্রাপ্ত সেনাবাহিনীর লোকদের ব্যবহার করছে, তাদের সন্ত্রাসবাদের পথে প্ররোচিত করছে। শিখ জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থের সঙ্গে এই আন্দোলনের কোনো সম্পর্ক নেই। এটি জাতীয়তা-বিরোধী দেশদ্রোহী আন্দোলন।

এই বিভেদকামী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলি শুধু দেশের ঐক্য ও জাতীয় সংহতি বিনষ্ট করছে তাই নয়, এদের কার্যকলাপ বিদেশী শত্রুদেরও যথেষ্ট উৎসাহিত করছে এবং তারা ঐ বিভেদের শক্তিগুলিকে নানারূপে সাহায্য করছে।

যেহেতু ভারত সরকার সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্বের নীতি অনুসরণ করছে, এবং জোটনিরপেক্ষতার নীতিতে অবিচল রয়েছে, আভ্যন্তরীণ অর্থ-নীতির ক্ষেত্রে ভারত সরকার স্বয়ম্ভরতার নীতি অনুসরণ করছে, তাই আমেরিকা ভারত সরকারের উপর বিশেষ রুষ্ট। তারা তাই ভারতে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির জন্যও (de-stabilisation) নানা ফন্দি আঁটছে।

এই কাজে পাকিস্তান তার ঘনিষ্ঠ সহচর হিসাবে কাজ করছে। ইন্দিরা হত্যার রহস্য যদি কখনও উদ্ঘাটিত হয় তাহলে এবিষয়ে বহু তথ্য জানা যাবে।

একথা কে না জানে যে পাঞ্জাবে খালিস্তানী আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছে পাকিস্তানের ভূমিখণ্ড থেকে এবং এই আন্দোলনের পিছনে রয়েছে আমেরিকার গোপন সমর্থন।

আরেকটি উদাহরণ—ত্রিপুরি উপজাতীয় সন্ত্রাসবাদীরা তাদের বাংলাদেশের ঘাঁটি ব্যবহার করে ভারত-বিরোধী কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদের সাহায্যপুষ্ট মিশনারীরা ও একধরনের বিদেশী 'গবেষক' উত্তর-পূর্ব ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলিকে নানাভাবে সাহায্য করছে।

এই সব প্রচেষ্টারই লক্ষ্য এক—ভারতের ঐক্য বিনষ্ট করা এবং ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে অস্থিতিশীলতার উপাদানগুলি সৃষ্টি করা।

এই বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন দমনে কিছু কিছু উদ্যোগ নিলেও মনে রাখতে হবে এই সমস্যা গড়ে ওঠার মূল কারণ ভারত সরকার অনুসৃত নানা ধরনের ভ্রান্ত নীতি।

জাতিসমস্যা সমাধানে বর্তমান সরকারের ব্যর্থতা থেকেই বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনগুলির সৃষ্টি। বর্তমান সরকারের নীতি যেমন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, তেমনি আবার জনবিরোধীও বটে। ধনতন্ত্রের পথ আঁকড়ে থাকার দরুণ শুধু শ্রমজীবী জনগণের সমস্যাই নয়, এই সরকার দেশের গণতান্ত্রিক পুনর্গঠনের অত্যাবশ্যক কাজগুলিরও মীমাংসা করতে পারছে না (যেমন, জাতি-সমস্যা, ভাষাগত সমস্যা, জাত-পাতের সমস্যা, হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক সমস্যা প্রভৃতির কথা বলা চলে)। এর ফলে শুধু শ্রমজীবী জনগণ নয়, অপেক্ষাকৃত অনুন্নত জাতি ও ভাষাগোষ্ঠীর লোকেরা (ধনী, নির্ধন, নির্বিশেষে) ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ধনতন্ত্রের পথ আঁকড়ে থাকার ফলে এই সরকারের আশীর্বাদপুষ্ট বৃহৎ বুর্জোয়া গোষ্ঠী (যারা হিন্দী ভাষাভাষী পার্শ্ব-মারোয়ারী সম্প্রদায়ভুক্ত) অপেক্ষাকৃত অনুন্নত জাতিগোষ্ঠীর উপর চরম নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত জাতি উপজাতিগুলির সর্বাংশের মানুষেরা নিজেদের নির্যাতিত ও বঞ্চিত বলে মনে করছে। এইসব অনুন্নত জাতির বুর্জোয়া ভাবাপন্ন বুদ্ধিজীবীদের নেতৃত্বে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন মাথাচাড়া দিচ্ছে। ধনতন্ত্রের পথের কল্যাণে পার্বত্য-

জাতীয় লোক-অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি (সাঁওতাল, কোল, ওঁরাও প্রভৃতি) বৃহৎ বুর্জোয়াদের মৃগয়াক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। (এখানে বিহারে রাঁচি, সিংভূম প্রভৃতি আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে একচেটিয়া বুর্জোয়াদের কোনো কোনো অংশের অনুপ্রবেশের কথা ধরা যেতে পারে।)

পাঞ্জাব সমস্যাটিও মূলত: বিভিন্ন জাতিভুক্ত বুর্জোয়াদের মধ্যে বিরোধ থেকেই উদ্ভূত। ভারত সরকারের উপর যে বৃহৎ বুর্জোয়ারা (টাটা, বিড়লা, সিংহানীয়া প্রভৃতি) প্রভাব বিস্তার করে রয়েছে, উদীয়মান শিখ বুর্জোয়ারা মনে করছে তাদের উন্নতির পথে তাঁরা বাধাস্বরূপ। ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শিখ বুর্জোয়ারা নিজস্ব খালিস্তান রাজ্য গঠন করে নিরুপদ্রব এক শোষণ-ক্ষেত্র গড়ে তুলতে চায়।

বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের সীমারেখার মধ্যে জাতিসমস্যার স্থায়ী সমাধান কিছুতেই সম্ভব নয়। একমাত্র অ-ধনতান্ত্রিক পথের মাধ্যমেই এই সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হতে পারে। অ-ধনতান্ত্রিক পথে গড়ে ওঠে এমন এক অর্থনীতি যাতে ধনতন্ত্রের মাৎস্য-ন্যায়ের লীলাখেলা বন্ধ। এতে বড় মাছের পক্ষে ছোট মাছকে গিলে ফেলার সুযোগ নেই। অর্থাৎ বড় বুর্জোয়ারা মাঝারি বুর্জোয়া এবং ছোট বুর্জোয়াদের ইচ্ছামতো শোষণ করার সুযোগ পায় না। এই কারণে এই ব্যবস্থায় কয়েকটি বিশেষ জাতির অন্তর্ভুক্ত বৃহৎ বুর্জোয়ারা অপেক্ষাকৃত অনুন্নত জাতিগুলিকে শোষণ করার অধিকার থেকে বঞ্চিত। অ-ধনতান্ত্রিক পথ সমাজতন্ত্রমুখীন—তাই এই ব্যবস্থায় অপেক্ষাকৃত উন্নত জাতিগুলি স্ব-মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত থাকার সুযোগ পাবে, তবে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত জাতিগুলির মর্যাদার বিনিময়ে নয়। এই ব্যবস্থায় অপেক্ষাকৃত অনুন্নত জাতি-উপজাতিগুলি অপেক্ষাকৃত উন্নত জাতিগুলির সঙ্গে সমমর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকবে। অপেক্ষাকৃত অনুন্নত জাতি উপজাতিগুলির অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ক্রমবিকাশের ধারাকে উন্মুক্ত করে দেবার কাজে রাষ্ট্র সবসময়ই সজাগ থাকবে। এখানে সোভিয়েত ইউনিয়নের দৃষ্টান্ত সামনে রাখা প্রয়োজন। এককালে এই দেশটি 'prison-house of nations' নামে পরিচিত ছিল। সোভিয়েত বিপ্লবের পরে এই দেশে সমাজতান্ত্রিক নীতির ভিত্তিতে জাতিসমস্যার পূর্ণ সমাধান সম্ভবপর হয়েছে। সেখানে অপেক্ষাকৃত উন্নত ও অপেক্ষাকৃত অনুন্নত জাতি-উপজাতিগুলি সমমর্যাদায় অধিষ্ঠিত।

একদিকে যেমন প্রতিটি জাতি-উপজাতির নিজস্বতা (identity) সুরক্ষিত তেমনি জাতি-উপজাতি নির্বিশেষে সমস্ত দেশটি সমাজতান্ত্রিক নীতির দ্বারা পরিচালিত হওয়ার ফলে সম্পূর্ণ শোষণমুক্ত। অ-ধনতান্ত্রিক পথ অনুসরণকারী দেশগুলিতেও জাতিসমস্যার সমাধান হয়ে থাকে প্রত্যেকটি জাতির সংখ্যাগুরু জনগণের (অর্থাৎ শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত) স্বার্থকে সামনে রেখে। তাই এই ব্যবস্থায় প্রত্যেকটি জাতির জাতিগত আশা-আকাঙ্ক্ষা (যেমন, ভাষা, সংস্কৃতি প্রভৃতির অব্যাহত উন্নতি বিধান, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে নিজস্ব রাষ্ট্র গঠনের অধিকার) যেমন সুরক্ষিত তেমনি শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থরক্ষার কাজ (যেমন কৃষকের স্বার্থে জমি বণ্টন, শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি ও শিল্প পরিচালনার ন্যায্য অধিকার, মধ্যবিত্তের বেকার সমস্যার সমাধান) পাশাপাশি চলতে থাকে। আসল কথা, জনগণের স্বার্থে জাতিসমস্যার সমাধান করতে হবে। অর্থাৎ এমনভাবে জাতি-সমস্যার সমাধান করতে হবে যাতে প্রত্যেকটি জাতির অন্তর্ভুক্ত সংখ্যাগুরু অংশ কি জাতিগত অধিকারের কি জীবিকাগত-পেশাগত অধিকারে—উভয় ক্ষেত্রেই সমাজে প্রাধান্য লাভ করতে পারে।

ভারতে জাতিসমস্যা সমাধানের বিষয়টি খুবই জটিল। কোনো সরলরেখায় এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়।

মনে রাখতে হবে ভারত একটি বহুজাতিক (multi-national) এবং বহু ভাষভাষী দেশ। একই রং-এর আঁচড়ে সমস্ত ভারতবর্ষকে অঙ্কিত করা সম্ভব নয়। নানা রং-এ রঞ্জিত এই বিশাল দেশ। এখানে বাস করে নানা জাতি ও উপজাতির লোক। এখানকার লোকেরা বহু ভাষাভাষী, বহু লোক সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ ভারতের জনসমষ্টি। কিন্তু বিবিধের মাঝে আছে ঐক্য : ছোট-বড়, উন্নত-অনুন্নত অসংখ্য জাতি-উপজাতি নিয়ে গড়ে উঠেছে এক মহাভারত। বিবিধের মাঝে সমগ্রকে গড়ে তোলার সমস্যা ভারতের সমস্যা।

কয়েকটি সুনির্দিষ্ট নীতির ভিত্তিতে জাতিসমস্যা, ভাষাসমস্যা প্রভৃতির সমাধান খুঁজে বের করতে হবে। বিবিধের অধিকার স্বীকার করতে হবে কিন্তু সমগ্রের স্বার্থের বিনিময়ে নয়। জাতিসংখ্যা, ভাষাসমস্যা প্রভৃতিকে খণ্ডিত বিকৃত দৃষ্টি থেকে বিচার করা গর্হিত অপরাধ। বিবিধকে সমগ্রের বিরুদ্ধে দাঁড় করানো, ঐক্য ও সংহতির বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্নতাকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে বড় করে তোলাই যেখানে উদ্দেশ্য সেখানে জাতিসমস্যার বা ভাষা-

সমস্যার সমাধান হবে না। এই পথে বিভেদ, বিচ্ছিন্নতাবাদ সমস্যাকে গ্রাস করবে, ভারত তার ভারত আত্মা হারাবে।

আগেই বলেছি জাতিসমস্যা সমাধানের প্রশ্নটি খুবই জটিল। প্রত্যেকটি জাতি উপজাতির শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিরা, রাজনৈতিক দলগুলির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা, জাতিসমস্যা নিয়ে নিযুক্ত গবেষকেরা—সকলে মিলিত হয়ে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এই সমস্যার দীর্ঘস্থায়ী সমাধান খুঁজে বের করতে চেষ্টা করবেন।

এখানে এমন কয়েকটি একান্ত জরুরী সমস্যা প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে যার অবিলম্বে সন্তোষজনক সমাধান প্রয়োজন :

১। সাঁওতাল উপজাতিদের সমস্যা ; বর্তমানের ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের পরিবর্তে নীতিনিষ্ঠ ভিত্তিতে এই প্রশ্নের সমাধান খুঁজতে হবে। এই প্রশ্নে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বিহার রাজ্য পরিষদের বক্তব্যকে ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

২। ত্রিপুরি উপজাতিদের সমস্যা : এই সমস্যাটি একান্ত সহানুভূতির সঙ্গে বিচার করতে হবে। ত্রিপুরি জাতির আত্মস্ফুরণের মাধ্যমগুলিকে বিকশিত করার লক্ষ্য নিয়ে আরও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এই দিক থেকে ত্রিপুরার বামপন্থী সরকার যে নীতি গ্রহণ করছে তার ইতিবাচক দিকগুলিকে তুলে ধরার সঙ্গে সঙ্গে তাকে আরও সম্প্রসারিত করার কথা চিন্তা করতে হবে। যাতে ত্রিপুরি উপজাতিদের উগ্রপন্থীদের প্রভাব থেকে পুরোপুরি মুক্ত করা যায় সেইদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

৩। গোর্খা উপজাতিদের সমস্যার ; সুভাষ ঘিসিং-এর নেতৃত্বে যে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন গড়ে উঠেছে তাকে প্রতিহত করতে হবে। কিন্তু কিসের ভিত্তিতে ? এই আন্দোলন জাতীয়তাবিরোধী, এই আন্দোলন নতুন করে বঙ্গ বিভাগ করতে যাচ্ছে—এইসব যুক্তি সাধারণ বাঙ্গালীর মনে, প্রভাব বিস্তার করতে পারে, কিন্তু গোর্খাদের মনকে এতটুকু প্রভাবিত করবে কিনা তা ভেবে দেখা প্রয়োজন। গোর্খা উপজাতির অধিকাংশের আশা-আকাঙ্ক্ষা স্পর্শ করতে হলে যেমন চা বাগিচার কুলিদের ও স্থানীয় কৃষকদের দাবীদাওয়া নিয়ে আন্দোলনে নামতে হবে, তেমনি একান্ত সহানুভূতির সঙ্গে তাঁদের জাতিগত আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্বলিত দাবীগুলি আদায়ের জন্যও আন্দোলনে নামতে হবে যেমন গোর্খা অধ্যুষিত অঞ্চলের অর্থনৈতিক

অনগ্রসরতা দূরীকরণের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, নেপালী ভাষাকে ন্যায্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, এ অঞ্চলে রাজনীতিক ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায় গোর্খাদের অগ্রাধিকার স্বীকার করতে হবে। এক কথায়, আঞ্চলিক স্বায়ত্ব শাসন শুধুমাত্র একটি স্লোগানে পর্যবসিত হতে দেওয়ার চলবে না। একে বাস্তবে, পরিণত রূপ দেবার জন্য একটি মাষ্টার প্ল্যান তৈরী করতে হবে।

৪। পাঞ্জাবের সমস্যাটি খুবই জটিল এবং সমাধানও খুবই কঠিন। ধর্মান্ধতা, সন্ত্রাসবাদ ও দেশদ্রোহীতাকে মূল শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করে এই প্রশ্নের ধর্ম-নিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক সমাধান খুজে বের করতে হবে।

মূল্যায়ন পত্রিকার মালিকানা ও অন্যান্য বিবরণী

(৪ নং ফরম)

১। প্রকাশ স্থান—১০, বেণ্ডেল রোড, কলিকাতা-১৯

২। প্রকাশের সময়—ত্রৈমাসিক

৩। মুদ্রক—রণধীর দাশগুপ্ত

জাতীয়তা—ভারতীয়

ঠিকানা—১০, বেণ্ডেল রোড, কলিকাতা-১৯

৪। প্রকাশক—রণধীর দাশগুপ্ত

জাতীয়তা—ভারতীয়

ঠিকানা—১০, বেণ্ডেল রোড, কলিকাতা-১৯

৫। সম্পাদক—নরহরি কবিরাজ

জাতীয়তা—ভারতীয়

ঠিকানা—১০, বেণ্ডেল রোড, কলিকাতা-১৯

৬। স্বত্বাধিকারীর নাম ও ঠিকানা—সমীক্ষা প্রকাশনী

ঠিকানা—১০, বেণ্ডেল রোড, কলিকাতা-১৯

আমি, রণধীর দাশগুপ্ত, এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে উপরিলিখিত বিবরণ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

তাং ১০।৪।৮৭

রণধীর দাশগুপ্ত

সম্পাদক

নিয়মাবলী

গ্রাহক সংক্রান্ত

নববর্ষ সংখ্যা পাঁচ টাকা

শারদীয় সংখ্যা দশ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা বারো টাকা

বছরের যে-কোন সময় থেকে গ্রাহক হওয়া যায়

ডাক খরচ আমাদের।

এজেন্সী সংক্রান্ত

কমপক্ষে ৫ কপি নিতে হবে।

কমিশনের হার শতকরা ২৫ টাকা।

পত্রিকা ভি পি-তে পাঠানো হয়।

ডাক খরচ আমাদের।

যোগাযোগ করুন :

কর্মাধ্যক্ষ

মূল্যায়ন কার্যালয়

১০, বঙ্কিম রোড

কলিকাতা-

বিভিন্ন কৃষি উপকরণ ও সরঞ্জাম সরবরাহের জন্য
একমাত্র নির্ভরযোগ্য সরকারি প্রতিষ্ঠান।

ওয়েষ্ট বেঙ্গল এ্যাগ্রো ইণ্ডাষ্ট্রীজ কর্পোরেশন লিঃ

(একটি সরকারী সংস্থা)

২৩বি, নেতাজী সুভাষ রোড (৪র্থ তল)
কলিকাতা—৭০০ ০০১

চাষীভাইদের জন্য নিম্নলিখিত উৎকৃষ্ট মানের কৃষি উপকরণ সরঞ্জাম ঠিক মূল্যে সরবরাহ করা হয়।

ক) এইচ, এম, টি, ইন্টারন্যাশনাল। এসকর্টস। মিৎসুবিশি ট্রাক্টরস্
খ) কুবোটা। মিৎসুবিশি পাওয়ার টিলারস্।
গ) 'সুজলা' ৫ অশ্বশক্তি ডিজেল পাম্পসেট্।
ঘ) বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি, গাছপালা প্রতিপালন সরঞ্জাম।
ঙ) সার, বীজ ও কীটনাশক ঔষধ।

কর্পোরেশনের সরবরাহ করা কৃষি যন্ত্রপাতি অত্যন্ত উচ্চমানের তাছাড়া বিক্রয়ের পর মেরামতি ও দেখাশোনার দায়িত্ব নেওয়া হয়। যন্ত্রপাতির গুণগত মানের বা মেরামত করার বিষয়ে কোন অভিযোগ থাকলে জেলা অফিসে অথবা হেড অফিসে (ফোন নং ২০-২৩১৪/১৫) যোগাযোগ করুন।

জেলা অফিস

২৪-পরগণা (দক্ষিণ)	:	১৪, তারাতলা রোড, কলিকাতা-৮৮
,, (উত্তর)	:	ডাকবাংলো মোড়, বারাসাত
হুগলী	:	সাহাপুর রোড, তারকেশ্বর, আরামবাগ, হুগলি
বর্ধমান	:	সদরঘাট রোড, জি, টি, রোড, মেমারি বর্ধমান
বাঁকুড়া	:	লালবাজার, বাঁকুড়া ষ্টেশন রোড, বিষ্ণুপুর
মেদিনীপুর (ওয়েষ্ট)	:	সুভাষনগর, মেদিনীপুর
মেদিনীপুর (ইষ্ট)	:	পাঁশকুড়া রেলওয়ে ষ্টেশন, পোঃ পাঁশকুড়া
বীরভূম	:	সিউড়ি
মালদা	:	মনস্কামনা রোড, মালদা
মুর্শিদাবাদ	:	১৬, শহীদ সূর্য সেন ষ্ট্রীট, বহরমপুর
জলপাইগুড়ি	:	'সবারি' কাছারি রোড, জলপাইগুড়ি
দার্জিলিং	:	বাঘা যতীন পার্ক, শিলিগুড়ি
কুচবিহার	:	এন, এন, রোড, কোচবিহার
পুরুলিয়া	:	নীলকুঠী ডাঙ্গা রোড, পুরুলিয়া

MULYAYAN Nabavarsa
1987 R. N. 13785/65

SOME IMPORTANT SOVIET DESH BOOKLETS IN BENGALI

1. XXVII CPSU Congress : Documents and Resolution
2. On the New Edition of the CPSU Programme
3. Lenin on US Imperialism
4. Dialogue Between Trusted Friends

19 JUN 9?

To be published very Shortly

1. The Fundamental Law of the USSR
2. Fraternal Alliance
3. The Soviet Union : Facts, Problems. Assesments

Interested persons can write to the following address :

SOVIET DESH OFFICE.
Booklet Section,
18, Pramathes Barua Sarani,
Calcutta-700 019

মূল্যায়ন ১০, বণ্ডেল রোড, কলকাতা-৭০০ ০১৯ দাম : পাঁচ টাকা